وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখের ১৪৪৮ নভেম্বর ২০২৬

Web : www.al-itisam.com



হুথি বনাম সঊদী

এক ভয়াবহ যুদ্ধের মুখোমুখি মুসলিম উম্মাহ

MONTHLY AL-ITISAM

Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**

Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH

Printed By : Al-Itisam printing press

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840

E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.

السنة: ١١، جمادى الأول و جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ / نوفمبر ٢٠٢٦م العدد: ١، الجزء: ١٢١

تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش

رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত

প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লাহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | বীরহাটাব-হাটার, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ | নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটার, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৫৮-৫৬৬৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৫২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাবীপাড়া, পবা, শাহমখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৩১৬৬৯

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৮ || ঈসায়ী ২০২৬ || বঙ্গীয় ১৪৩৩

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
নভেম্বর-০১	জুমাদাল উলা-২০	সোমবার	৪:৪৮	৬:০৪	১১:৪৩	২:৫৬	৫:২১	৬:৩৭
নভেম্বর-০৫	জুমাদাল উলা-২৪	বৃহস্পতিবার	৪:৫০	৬:০৬	১১:৪৩	২:৫৪	৫:১৯	৬:৩৫
নভেম্বর-১০	জুমাদাল উলা-২৯	মঙ্গলবার	৪:৫৩	৬:০৯	১১:৪৪	২:৫৩	৫:১৬	৬:৩৩
নভেম্বর-১৫	জুমাদাল আখিরা-০৪	রবিবার	৪:৫৫	৬:১২	১১:৪৪	২:৫১	৫:১৪	৬:৩১
নভেম্বর-২০	জুমাদাল আখিরা-০৯	শুক্রবার	৪:৫৮	৬:১৬	১১:৪৫	২:৫১	৫:১৩	৬:৩১
নভেম্বর-২৫	জুমাদাল আখিরা-১৪	বুধবার	৫:০০	৬:১৮	১১:৪৬	২:৫০	৫:১২	৬:৩০
নভেম্বর-৩০	জুমাদাল আখিরা-১৯	সোমবার	৫:০৪	৬:২২	১১:৪৮	২:৫০	৫:১২	৬:৩১

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+১	০	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-১	-১	-২
টাঙ্গাইল	+৩	+২	+১
ফরিদপুর	+৩	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০
গোপালগঞ্জ	+২	+১	+৩
মাদারীপুর	+১	০	+২
মানিকগঞ্জ	+৩	+২	+২
শরিয়তপুর	০	-১	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	+১	+১	-১
শেরপুর	+৩	+৩	০
জামালপুর	+৩	+৩	+১
নেত্রকোনা	-১	-১	-৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৫	-৬	-৩
কক্সবাজার	-৮	-৯	-৪
খাগড়াছড়ি	-৮	-১০	-৬
রাঙ্গামাটি	-৮	-৯	-৬
বান্দরবান	-৯	-১০	-৬
কুমিল্লা	-৩	-৪	-৩
নোয়াখালী	-৩	-৪	-২
লক্ষীপুর	-২	-৩	-১
চাঁদপুর	-১	-২	-১
ফেনী	-৪	-৬	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৪

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৫	-৫	-৭
সুনামগঞ্জ	-৩	-৩	-৫
মৌলভীবাজার	-৫	-৬	-৭
হবিগঞ্জ	-৩	-৪	-৫

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৮	+৮	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৮
নাটোর	+৬	+৬	+৫
পাবনা	+৫	+৫	+৪
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২
বগুড়া	+৫	+৫	+৩
নওগাঁ	+৭	+৭	+৫
জয়পুরহাট	+৬	+৬	+৪

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৬	+৭	+২
দিনাজপুর	+৭	+৮	+৪
গাইবান্ধা	+৫	+৫	+২
কুড়িগ্রাম	+৫	+৫	+১
লালমনিরহাট	+৬	+৬	+১
নীলফামারী	+৮	+৯	+৪
পঞ্চগড়	+৯	+১০	+৪
ঠাকুরগাঁও	+১০	+১০	+৬

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৩	+২	+৫
বাগেরহাট	+২	+১	+৪
সাতক্ষীরা	+৫	+৩	+৬
যশোর	+৫	+৪	+৬
চুয়াডাঙ্গা	+৫	+৪	+৫
ঝিনাইদহ	+৫	+৪	+৫
কুষ্টিয়া	+৬	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৭
মাগুরা	+৪	+৩	+৪
নড়াইল	+৩	+২	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	০	-২	+১
পটুয়াখালী	০	-২	+২
পিরোজপুর	+১	০	+৩
ঝালকাঠি	০	-১	+২
ভোলা	-২	-৩	০
বরগুনা	+১	-১	+৩

■ সূত্র : ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org)
■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلة الإعتصام الشهرية

মাসিক আল-ইতিছাম
কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

www.al-itisam.com

১১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০২৬ খ্রি.,
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখের ১৪৪৮ হিজরী

উপদেষ্টা
শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
মো. আকরাম হোসেন
আব্দুল্লাহ মাহমুদ

বিভাগীয় সম্পাদক
মো: নাসির উদ্দিন, আল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মোঃ নাইমুল ইসলাম

ফাতাওয়া হটলাইন: ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০
সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট
monthlyalitisam@gmail.com

সূচিপত্র

» **সম্পাদকীয় ॥ ০২**

» **কুরআনের গভীরে**

সূরা আল-ইনশিরাহর আলোকে সংকট-পরবর্তী মানুষ গঠনের দর্শন (পূর্ব প্রকাশিতের পর)...৪
-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক

» **প্রবন্ধ**

বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা'আতের সাথে যোগদান করার হুকুম (পর্ব-৭) ৭
মূল: ড. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ
পরিমার্জন: সা'দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুছায়্যিন
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সালাফদের অমিয় বাণী.....১১
মূল: আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর
অনুবাদ: রিফাত সাঈদ

পরিবারে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা: তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ.....১৩
-নাজমুস সাকিব বিন আব্দুর রাজ্জাক

বই থেকে স্ক্রিন: একটি জাতির নীরব পতন (পর্ব-২) ১৫
-আব্দুল গাফফার মাদানী

» **হারামাইনের মিম্বার থেকে**

প্রতারণা বরকত ধ্বংসের কারণ ১৯
অনুবাদ: ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

» **কুরআনের মর্মবাণী**

রবের বাণী (পর্ব-১১).....২২
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» **খুলুকুল মুসলিম**

শাসক ও নিজের সাথে একজন মুসলিমের আচরণ.....২৩
মূল: সুলতান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-উমরী
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ বিন সাইদুর রহমান

» **সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন**

রুকূর মাঝের সুন্নাতসমূহ.....২৫
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

» **সাময়িক প্রসঙ্গ**

হতাশাই শেষ কথা নয়: আত্মহত্যার বিরুদ্ধে ইসলামের বার্তা.....২৬
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

» **তারবিয়াতুল আওলাদ**

সন্তান কি আপনার অপূর্ণ স্বপ্নের বাহক? ২৯
-জাহিদ হাসান

» **শিক্ষার্থীদের পাতা**

রাবীদের অদ্ভুত নামের রহস্য ৩২
-মাজহারুল ইসলাম আবির

» **মনীষীদের জীবনী**

ইলমুল হাদীছের অনন্য সাধক শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী ... ৩৫
-ড. নূর মোহাম্মদ

» **কবিতা ॥ ৩৯**

» **সংবাদ ॥ ৪০**

» **সওয়াল-জওয়াব ॥ ৪৩**



সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

হুথি বনাম সঊদী: এক ভয়াবহ যুদ্ধের মুখোমুখি মুসলিম উম্মাহ

ইয়ামান ইতিহাসসমৃদ্ধ একটি দেশ। সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর যুগে সাবার রানি বিলকিসের যে কাহিনি এসেছে, তা ইয়ামানের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর সময়ের যে উন্নত সাম্রাজ্যের কথা এসেছে, তা বর্তমান ইয়ামানের মারিব অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আবরাহার যে বাহিনী কা'বাঘর ধ্বংস করতে এসেছিল, তারা ইয়ামান থেকেই এসেছিল। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র মূলত ইয়ামানী বংশোদ্ভূত। অর্থাৎ, আনছারদের অধিকাংশের আদি নিবাস ছিল ইয়ামানে। শুধু তাই নয়, মা হাজেরা (আ.) যখন যমযম কূপের পাশে বসবাস শুরু করেন, তখন জুরহুম গোত্র তাঁর অনুমতি নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করে। গোত্রটি ছিল ইয়ামানী বংশোদ্ভূত। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এই গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করেন। এ কারণে বংশপরম্পরায় ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশধরদের সঙ্গে ইয়ামানী গোত্রের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমনকি আরবীর মূল ভিত্তি ও আরব জাতির মূল ভিত্তি যে কাহতানীদের ধরা হয়, তারা ইয়ামানী। তথা মূল আরব সংস্কৃতি মূলত ইয়ামানী সংস্কৃতি। আর ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশধরদের আদনানী আরব বলা হয়। যারা মূলত ইয়ামানী কাহতানীদের থেকে আরবী ভাষা শিখেছেন। আর এসব কারণে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে ইয়ামানের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। ইয়ামানের সাথে আল্লাহর নবীকে বা ছাহাবীদেরকে কখনোই কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি। তারা শুধু ইসলামের দাওয়াত পেয়েই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেমন আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামান থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ইয়ামানে ইসলামের শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে পাঠানো হয়েছিল। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামান এবং শামের জন্য বিশেষভাবে দু'আ করেছেন। অন্য কোনো দেশ বা অঞ্চলের জন্য তিনি বিশেষভাবে দু'আ করেননি। তিনি বলেছেন, ঈমান ইয়ামানী আর হিকমাহ বা প্রজ্ঞাও ইয়ামানী। এই কথার ওযন কত বড় ও বিশাল তা একমাত্র চিন্তাশীলরাই অনুভব করতে পারবে। তিনি বলেছেন, ইয়ামানের মানুষের অন্তর নরম। কা'বাঘরের একটি রুকনকে ইয়ামানের নামে রুকনে ইয়ামানী করা হয়েছে। সেই ইয়ামান আজ রক্তাক্ত। শামের মানুষের রক্তপাত আমাদের যেভাবে ব্যথিত করত, ইয়ামানের মানুষের রক্তপাতও আমাদের সেভাবে ব্যথিত করছে। যে ইয়ামান ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত, আজ সেই ইয়ামানে একজন আরেকজনকে হত্যার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

বর্তমান ইয়ামানের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের পটভূমি জানতে হলে সর্বপ্রথম হুথিদের সম্পর্কে জানতে হবে। হুথিরা ইয়ামানের উত্তরাঞ্চলভিত্তিক যায়দী শী'আ পটভূমি থেকে উঠে আসা একটি সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন। যায়দিয়্যাহর নামকরণ হয়েছে যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালেব রাহিমাহুল্লাহ-এর নামানুসারে। তিনি ছিলেন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নাতি। ১২২ হিজরীতে উমাইয়া শাসক হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের শাসনামলে কূফায় বিদ্রোহের সময় তিনি নিহত হন। ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

যায়েদ ইবনে আলী রাহিমাহুল্লাহ-কে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। যখন তিনি উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন কূফার একদল শীআ অনুসারী তাকে শর্ত দেয় যে, তারা তাঁকে এই বিদ্রোহে তখনই সমর্থন দেবে, যখন তিনি প্রথম দুই খলীফা আবূ বকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বর্জন করবেন

বা তাঁদের গালি দেবেন। যায়েদ ইবনে আলী রহিমাহুল্লাহ তাদের এই অন্যায় দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং দুই খলীফার প্রশংসা করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওই অনুসারীরা তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। তাদের এই দলত্যাগের কারণে যায়েদ ইবনে আলী রহিমাহুল্লাহ তাদের 'রাফেজী' (প্রত্যাখ্যানকারী) বলে আখ্যায়িত করেন। পরবর্তীতে শীআদের মধ্যে যারা ছাহাবীদের গালি দেয়, তাদেরকে এই নামেই আরবী ভাষায় সম্বোধন করা হয়ে থাকে। আর যারা তার সমর্থনে তার পাশে থেকে যান, তারা 'যায়দিয়্যাহ' নামে পরিচিতি পান। তথা যায়দিয়্যাহরা আহলুস সুন্নাহ ও শীআদের মধ্যবর্তী একটি জামাআত। এই জন্য যায়দী শীআ পরিবারে জন্ম নিলেও পরবর্তীতে অনেক আলেম পূর্ণ আহলুস সুন্নাহর অনুসারী হয়ে অনেক বড় ইমামও হয়েছেন। যেমন ইমাম শাওকানী, ইমাম সানআনীসহ প্রমুখ।

যাহোক, তৃতীয় হিজরী শতকের শেষভাগে আল-হাদী ইয়াহইয়া ইবনুল হুসাইনের মাধ্যমে উত্তর ইয়ামানে যায়দী ইমামতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। উছমানীয় খিলাফতের অধীনে ইয়ামানের এই উত্তরাঞ্চল এক প্রকার স্বাধীন ছিল অন্যদিকে ইয়ামানের দক্ষিণাঞ্চল ছিল ব্রিটিশদের কলোনি।

ষাটের দশকে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান হলে মিশরের জামাল আব্দুল নাছের ইয়ামানের সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সমর্থন করে। অন্যদিকে সঊদী আরব উত্তরাঞ্চলে যায়দী শীআদের রাজতন্ত্রকে সমর্থন করে। আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে জামাল আব্দেল নাছেরের পরাজয় হলে সে ইয়ামান থেকে তার সৈন্য গুটিয়ে নেয়। একই সময়ে দক্ষিণ ইয়ামানও ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তখন থেকেই মূলত দুই ইয়ামান একত্রিত করার আলোচনা চলছিল। পরবর্তীতে দুই ইয়ামানের সীমান্তে প্রচুর তেলের খনি আবিষ্কার হলে উভয় ইয়ামান একত্রিত হওয়ার কাজ গতি পায়।

উত্তরে আলী আব্দুল্লাহ ছালেহ ও তাঁর 'জেনারেল পিপলস কংগ্রেস' বা জিপিসি ক্ষমতার কেন্দ্রে আসে; দক্ষিণে নেতৃত্ব দেয় 'ইয়ামানী সোশ্যালিস্ট পার্টি' বা ওয়াইএসপি। ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে ছালেহ ও দক্ষিণের নেতা আলী সালেম আল-বীধ ঐক্য সংবিধানের খসড়া গ্রহণ করেন। ধারাবাহিক আলোচনার পর ১৯৯০ সালের ২২ মে দুই রাষ্ট্র একীভূত হয়ে 'ইয়ামান প্রজাতন্ত্র' গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও স্পিকার প্রভৃতি পদ ভাগাভাগি হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা থেকে যায় সেনাবাহিনী কখনোই পরিপূর্ণ একীভূত হয়নি। বরং দক্ষিণ ও উত্তরের সেনাবাহিনী সবসময় স্বতন্ত্রই থেকে গেছে। যেটিই মূলত আজকের চলমান সংকটসহ পরবর্তী সকল সংঘাতের অন্যতম একটি কারণ। ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে ছালেহের একচ্ছত্র বিজয়ে পুনরায় উত্তর ও দক্ষিণ ইয়ামান গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। তবে এই যুদ্ধে ছালেহ বিজয় অর্জন করলেও সকলের চোখের আড়ালে দীর্ঘ সময় যাবৎ ক্ষমতা দূরে থাকা যায়েদী শীআদের ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয় শাবাব আল-মুসলিম নামে। যা কিছুটা ইরানী বিপ্লব অনুপ্রাণিত আমেরিকা-ইসরাঈল বিরোধিতার ফ্লেভার মিশ্রিত ধর্মীয় আন্দোলন। যার নেতৃত্ব দেয় হুসাইন বদরুদ্দীন আল-হুথি। তার নামানুসারেই পরবর্তীকালে অনুসারীরা 'হুথি' নামে পরিচিত হন। তবে রাজনৈতিক কারণে বর্তমান হুথিদের আক্বীদা ও বিশ্বাস পূর্বের যায়দীদের চেয়ে বর্তমান ইরানী ইছনা আশারিয়া ফিরক্বা দ্বারা বেশি প্রভাবিত। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপ নেয়।

২০০৪ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ছালেহ সরকার ও হুথিদের মধ্যে ছয় দফা যুদ্ধ হয়। ২০১১ সালের গণআন্দোলন ছালেহর দীর্ঘ শাসনকে বিপর্যস্ত করে। উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের উদ্যোগে ক্ষমতা হস্তান্তরের চুক্তির পর ২০১২ সালে তাঁর উপরাষ্ট্রপতি আব্দুর রব্বুহ মানছূর হাদী নতুন রাষ্ট্রপ্রধান হন। কিন্তু পদ ছাড়লেও ছালেহর রাজনৈতিক দল এবং সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রযন্ত্রে তাঁর অনুগতদের প্রভাব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি।

এরপর ছালেহর রাজনীতিতে ঘটে বড় মোড়। যাদের বিরুদ্ধে তিনি ছয় দফা যুদ্ধ করেছিলেন, সেই হুথিদের সঙ্গেই হাত মেলান। ছালেহ নিজের ক্ষমতাচ্যুতিতে ভূমিকা রাখা প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্বল করতে চেয়েছিলেন। হুথিরা পেল তাঁর সামরিক যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতার সুবিধা; ছালেহ পেলেন হারানো প্রভাব পুনরুদ্ধারের সুযোগ।

এই সহযোগিতা ২০১৪ সালে হুথিদের সানআ দখলের পথ সহজ করে। পরবর্তী সময়ে হাদী সরকারের বিরুদ্ধে হুথি–ছালেহ জোট যুদ্ধ চালায়।

২০১৭ সালের শেষদিকে ছালেহ ও হুথিদের বিরোধ প্রকাশ্য সংঘর্ষে রূপ নেয়। ডিসেম্বরের শুরুতে ছালেহ সঊদী নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অর্থাৎ এত দিনের সহযোগী হুথিদের ছেড়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে নতুন সমঝোতার পথে যেতে চান। কিন্তু এই পক্ষবদল তাঁর জন্য প্রাণঘাতী হয়। ৪ ডিসেম্বর হুথিরা তাঁকে হত্যা করে; হুথি–ছালেহ জোটের অবসান ঘটে।

বাকি অংশ ৫৬নং পেজে

কুরআনের গভীরে

সূরা আল-ইনশিরাহর আলোকে সংকট-পরবর্তী মানুষ গঠনের দর্শন

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি: সূরাটির বৈপ্লবিক ঘোষণা

সূরাটির কেন্দ্রীয় ঘোষণা আসে পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে, আল্লাহ বলেন, ‘অতএব, নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি রয়েছে’ *(আল-ইনশিরাহ, ৯৪/৫-৬)*।

এখানে শব্দচয়ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বলা হয়নি, কষ্টের অনেক পরে স্বস্তি আসবে; বলা হয়েছে, কষ্টের ‘সঙ্গে’ স্বস্তি রয়েছে। অর্থাৎ কষ্ট ও স্বস্তির সম্পর্ক সবসময় সরল সময়রেখার মতো নয়—প্রথমে শুধু কষ্ট, তারপর কষ্ট সম্পূর্ণ চলে গেলে স্বস্তি। বরং একটি কঠিন সময়ের ভেতরেও আল্লাহ স্বস্তির বিভিন্ন উপাদান উপস্থিত রাখতে পারেন।

কোনো বিপদ হয়তো মানুষকে তার আপনজনদের প্রকৃত ভালোবাসা চিনিয়ে দেয়। কোনো ব্যর্থতা তাকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনে। কোনো বিচ্ছেদ তাকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের সুযোগ দেয়। কোনো আর্থিক সংকট তাকে সংযম, পরিকল্পনা ও কৃতজ্ঞতা শেখায়। কোনো দীর্ঘ অপেক্ষা তার চরিত্রে ধৈর্য সৃষ্টি করে। আবার কখনও কষ্টের ভেতরে স্বস্তি আসে একটি দু‘আ, একটি উপলব্ধি, একজন সহানুভূতিশীল মানুষ কিংবা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটি বিকল্প পথের মাধ্যমে।

এর মানে এই নয় যে, প্রতিটি বিপদের কল্যাণ আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারব। কষ্টকে রোমান্টিক করাও এই আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। যুলম যুলমই, ক্ষতি ক্ষতিই, শোক শোকই। ইসলাম মানুষকে কৃত্রিম হাসি দিয়ে ব্যথা অস্বীকার করতে বলে না। বরং কুরআনের আশ্বাস হলো কষ্ট যত বাস্তবই হোক, সেটিই সামগ্রিক বাস্তবতা নয়। তার সঙ্গে আল্লাহর রহমত, সাহায্য, শিক্ষা ও সম্ভাবনার দরজাও উপস্থিত রয়েছে, যদিও মানুষ তা প্রথম মুহূর্তে দেখতে নাও পারে।

একই ঘোষণা পরপর দুবার আসা আশ্বাসটিকে হৃদয়ে গভীরভাবে স্থাপন করে। হতাশা মানুষকে একই নেতিবাচক কথা বারবার শোনায়, ‘আর কোনো পথ নেই’, ‘সব শেষ’, ‘তুমি পারবে না’। কুরআনও তার বিপরীতে আশার সত্যটি পুনরাবৃত্তি করে, কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি আছে, অবশ্যই আছে।

আরবী ভাষার একটি সূক্ষ্ম দিকও এখানে লক্ষণীয়। দুই আয়াতেই ‘কষ্ট’ নির্দিষ্ট রূপে এসেছে, আর ‘স্বস্তি’ এসেছে অনির্দিষ্ট রূপে। বহু মুফাসসির এর মধ্যে এই আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত দেখেছেন যে, একই কষ্টের সঙ্গে আল্লাহ একাধিক স্বস্তির পথ সৃষ্টি করতে পারেন। এখান থেকে জনপ্রিয়ভাবে বলা হয়, একটি কষ্ট দুটি স্বস্তিকে পরাজিত করতে পারে না। তবে এই বক্তব্যকে কোনো যান্ত্রিক বা গাণিতিক সূত্র না বানিয়ে কুরআনের শক্তিশালী আশ্বাস হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত।

কখনও স্বস্তি আসে পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার মাধ্যমে। ঋণ পরিশোধ হয়, অসুস্থতা সেরে যায়, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, বিরোধ মিটে যায়। আবার কখনও পরিস্থিতি পুরোপুরি না বদলালেও মানুষ বদলে যায়। সে আগের চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল হয়, অগ্রাধিকারের জ্ঞান লাভ করে, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করতে শেখে। এই অন্তর্গত পরিবর্তনও স্বস্তির একটি গভীর রূপ।

মানুষ সাধারণত স্বস্তিকে শুধু নিজের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। সে ভাবে, ‘আমি যা চাই, ঠিক সেভাবে ঘটলেই স্বস্তি’। কিন্তু আল্লাহর রহমত অনেক সময় প্রত্যাশিত দরজা দিয়ে আসে না। যে সুযোগটি আমরা চেয়েছিলাম সেটির দরজা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সেই বন্ধ দরজাই আমাদের ভিন্ন আরও নিরাপদ বা কল্যাণকর পথে নিয়ে যায়। যে সম্পর্কটি ধরে রাখতে চেয়েছিলাম তা শেষ হয়, কিন্তু সেই বিচ্ছেদ আমাদের আত্মসম্মান ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা ফিরিয়ে দেয়। যে পরিকল্পনাটি ব্যর্থ মনে হয়েছিল, সেটিই ভবিষ্যতে বড় বিপদ থেকে রক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

১* ফারেগ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত; বিএ (অনার্স), কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা, সঊদী আরব।

মুমিন তাই কষ্টের সময় শুধু মুক্তির অপেক্ষা করে না, সে কষ্টের ভেতরে থাকা স্বস্তির চিহ্নগুলোও খোঁজে। সে প্রশ্ন করে, এই পরীক্ষায় আল্লাহ আমাকে কী শেখাচ্ছেন? কোন অপ্রয়োজনীয় আসক্তি থেকে আমাকে মুক্ত করছেন? কোন মানুষগুলোর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করছেন? আমার ভেতরে কোন শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে? কোন নতুন দরজা দেখার জন্য পুরোনো দরজাটি বন্ধ হয়েছে?

এই প্রশ্নগুলো কষ্টকে সঙ্গে সঙ্গে দূর করে না, কিন্তু কষ্টের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বদলে দেয়। আর অনেক সময় এই বদলে যাওয়া সম্পর্কই ভেঙে পড়া ও বিকশিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে।

অবসর নয়, অর্থপূর্ণ স্থানান্তর

স্বস্তির সুসংবাদ দেওয়ার পর আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যখন আপনি অবসর পান, তখন পরিশ্রমে আত্মনিয়োগ করুন' *(আল-ইনশিরাহ, ৯৪/৭)*।

এই আয়াত সূরাটিকে শুধু সান্ত্বনার বার্তায় সীমাবদ্ধ থাকতে দেয়নি। আশ্বাসের পর এসেছে কাজের নির্দেশ। অর্থাৎ কুরআনিক আশা নিষ্ক্রিয় অপেক্ষার নাম নয়। এটি মানুষকে শক্তি সঞ্চয় করে অর্থপূর্ণ কাজে ফিরে যেতে শেখায়।

'যখন অবসর পান' অর্থাৎ একটি দায়িত্ব শেষ হলে জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যায় না। এক ধরনের কাজ থেকে অবসর পেলে অন্য কল্যাণকর কাজে মনোযোগ দিতে হবে। দৈনন্দিন দায়িত্ব শেষ হলে ইবাদতে, ফরয কাজের পর নফল কল্যাণে, ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের পর পরিবার ও সমাজের সেবায় মানুষকে অর্থপূর্ণভাবে অগ্রসর হতে হবে।

কষ্টের সময় যেমন মানুষ ভেঙে পড়তে পারে, তেমনি সাফল্যের পরও সে বিপদে পড়তে পারে। দীর্ঘদিনের একটি লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর অনেকেই শূন্যতায় আক্রান্ত হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, চাকরি পাওয়া, কোনো বড় প্রকল্প শেষ করা বা একটি সংকট কাটিয়ে ওঠার পর সে বুঝতে পারে না, এখন কী করবে। যেমন- ভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার পর অনেকেই পড়ার কিছু খুঁজে পায় না। কারণ তার সমগ্র পরিচয় একটি লক্ষ্যকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।

সূরা আল-ইনশিরাহ শেখায়, মুমিনের জীবন কোনো একটি অর্জনে থেমে যায় না। একটি কাজের সমাপ্তি অন্য অর্থপূর্ণ কাজের সূচনা করে। পার্থিব দায়িত্বের পর আধ্যাত্মিক দায়িত্ব, ব্যক্তিগত উন্নতির পর সামাজিক অবদান, জ্ঞান অর্জনের পর জ্ঞান বিতরণ—জীবনের এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে কল্যাণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

তবে 'পরিশ্রমে আত্মনিয়োগ' করার অর্থ নিজেকে বিশ্রামহীন যন্ত্রে পরিণত করা নয়। ইসলাম শরীর, মন ও পরিবারের অধিকারের কথা বলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা অনুযায়ী শরীরেরও মানুষের উপর অধিকার রয়েছে। অতএব, প্রয়োজনীয় বিশ্রামও দায়িত্বপূর্ণ জীবনের একটি অংশ। পার্থক্য হলো বিশ্রাম ও উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে। বিশ্রাম মানুষকে নতুন কাজের জন্য প্রস্তুত করে, আর উদ্দেশ্যহীনতা তার শক্তি ও সময়কে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে।

আধুনিক জীবনে মানুষ একদিকে অতিরিক্ত কর্মচাপে ক্লান্ত, অন্যদিকে অবসর পেলেই অর্থহীন বিনোদনের দীর্ঘ স্রোতে হারিয়ে যায়। কয়েক মিনিটের বিরতি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমনোযোগী পর্দা-নির্ভরতায় পরিণত হয়। এতে শরীর স্থির থাকলেও মন প্রকৃত বিশ্রাম পায় না। সূরা আল-ইনশিরাহর শিক্ষা হলো অবসরকে শূন্যতায় পরিণত না করে নবায়নের সুযোগে রূপান্তর করা।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। কাজ কষ্ট থেকে পালানোর উপায় হওয়া উচিত নয়। অনেক মানুষ নিজের অমীমাংসিত ব্যথা ভুলে থাকার জন্য অতিরিক্ত কাজে ডুবে যায়। বাইরে থেকে তাকে কর্মঠ মনে হলেও ভেতরে সে নিজের কষ্টের মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে চলছে। কুরআনিক কর্মশৃঙ্খলা হলো সচেতন কর্ম—যেখানে মানুষ নিজের ক্ষতকে স্বীকার করে, আল্লাহর সাহায্যে তা সামলায় এবং তারপর অর্থপূর্ণ দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করে।

সুতরাং সংকটের পর সুস্থ হয়ে ওঠার একটি লক্ষণ হলো মানুষ আবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারছে। সে শুধু অতীতের কষ্ট নিয়ে কথা বলছে না, বরং কষ্ট থেকে অর্জিত প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে নিজের ও অন্যের কল্যাণে এগিয়ে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি নিজে অন্ধকার পার হয়ে অন্যের জন্য আলো বহন করে, তার সংকট তখন শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতি থাকে না; বরং তা সামাজিক কল্যাণের উৎসে পরিণত হয়।

সকল আকাঙ্ক্ষার শেষ ঠিকানা

সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আপনার প্রতিপালকের প্রতিই আকৃষ্ট হোন' *(আল-ইনশিরাহ, ৯৪/৮)*।

আধুনিক প্রেষণামূলক দর্শন প্রায়ই বলে, নিজেকে বিশ্বাস করো। কুরআনও মানুষকে তার সামর্থ্য কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু শেষ ভরসার জায়গা হিসেবে নিজেকে দাঁড় করায় না। কারণ মানুষ নিজেই একদিন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন 'নিজেকে বিশ্বাস করো' কথাটিও আর তাকে ধরে রাখতে পারে না। কুরআনের শিক্ষা তাই আরও গভীর অর্থাৎ কাজ করো, কিন্তু হৃদয় রেখো রবের কাছে। কারণ সেই আশ্রয়ই একমাত্র স্থায়ী আশ্রয়, যা কখনও সরে যায় না।

এই আয়াত পুরো সূরার গন্তব্য নির্ধারণ করে দেয়। হৃদয় প্রশস্ত হলো, বোঝা হালকা হলো, মর্যাদা সমুন্নত হলো, কষ্টের সঙ্গে স্বস্তির আশ্বাস পাওয়া গেল এবং নতুন কাজে আত্মনিয়োগের নির্দেশ এলো; কিন্তু এসবের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কী? উত্তর হলো রবের দিকে ফিরে যাওয়া।

মানুষ কাজ করবে, পরিকল্পনা করবে, চিকিৎসা নেবে, সহযোগিতা চাইবে, সম্পর্ক নির্মাণ করবে এবং উন্নতির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। কিন্তু তার হৃদয়ের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা কোনো

মানুষ, প্রতিষ্ঠান বা পার্থিব ফলাফলের উপর নির্ভর করবে না। কারণ সৃষ্টি সীমাবদ্ধ, আর একমাত্র স্রষ্টাই অসীম।

আমাদের অনেক কষ্টের কারণ শুধু কোনো জিনিস না পাওয়া নয়; বরং সেই জিনিসটিকে হৃদয়ের চূড়ান্ত আশ্রয় বানিয়ে ফেলা। আমরা কখনও কোনো মানুষকে এমন জায়গায় বসাই, যেখানে শুধু আল্লাহর থাকার কথা। মনে করি, সে থাকলেই আমি নিরাপদ, সে প্রশংসা করলেই আমি মূল্যবান, সে চলে গেলে আমার জীবনের আর অর্থ নেই। কখনও চাকরি, সম্পদ, পদমর্যাদা বা সামাজিক পরিচয়কে এমনভাবে আঁকড়ে ধরি যে, সেগুলোর ক্ষতি আমাদের অস্তিত্বের ক্ষতি বলে মনে হয়।

শেষ আয়াত এই নির্ভরতার কেন্দ্র সংশোধন করে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকবে, কিন্তু উপাসনাসুলভ নির্ভরতা নয়। জীবিকার জন্য প্রচেষ্টা থাকবে, কিন্তু রিযিকের প্রকৃত মালিককে ভুলে যাওয়া নয়। সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা থাকবে, কিন্তু সাফল্যকে আত্মমূল্যের একমাত্র মানদণ্ড বানানো নয়।

'রবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া' শুধু মুখে দু'আ করার বিষয় নয়। এর অর্থ সিদ্ধান্তে তাঁর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া, সংকটে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া, সাফল্যে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা এবং কাজের পরিণাম তাঁর হাতে সমর্পণ করা। মানুষ সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে, কিন্তু ফলাফলের দাস হবে না। কারণ কর্ম মানুষের দায়িত্ব, আর ফলাফলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে।

এই আল্লাহমুখিতা মানুষকে অদ্ভুত এক স্বাধীনতা দেয়। তখন সে মানুষের প্রশংসা পেলে কৃতজ্ঞ হয়, কিন্তু অহংকারী হয় না; সমালোচিত হলে আত্মসমালোচনা করে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে না; সফল হলে কাজ চালিয়ে যায়, কিন্তু ব্যর্থ হলে আবার চেষ্টা করে। কারণ তার যাত্রা কোনো একটি পার্থিব ফলাফলে শেষ নয়, তার যাত্রা একমাত্র আল্লাহর দিকে।

সূরা আল-ইনশিরাহর মানুষ গঠনের ধারাবাহিকতা

সূরাটির আয়াতগুলো গভীরভাবে লক্ষ করলে একটি ধারাবাহিক নির্মাণপ্রক্রিয়া দেখা যায়।

প্রথমে আল্লাহ অন্তরকে প্রশস্ত করেন, কারণ সংকীর্ণ অন্তর বড় দায়িত্ব বহন করতে পারে না। এরপর বোঝা হালকা করেন, কারণ অতীতের ভারে ন্যুব্জ মানুষ সামনে এগোতে পারে না। তারপর মর্যাদার প্রকৃত উৎস চিনিয়ে দেন, যাতে মানুষ সামাজিক স্বীকৃতির দাস না হয়। এরপর কষ্টের সঙ্গে স্বস্তির নিশ্চয়তা দেন, যাতে হতাশা তার ভবিষ্যৎ কেড়ে নিতে না পারে। তারপর কাজে আত্মনিয়োগের নির্দেশ দেন, যাতে আশা অলসতায় পরিণত না হয়। সবশেষে আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষা নিবদ্ধ করেন, যাতে কাজ, সাফল্য ও স্বস্তি নতুন কোনো অহংকার বা আসক্তির জন্ম না দেয়।

এই ধারাবাহিকতা আজকের মানুষের পুনর্গঠনের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমরা প্রায়ই শুধু দ্রুত স্বস্তি চাই, কিন্তু স্বস্তি ধারণ করার মতো হৃদয় নির্মাণ করতে চাই না। বোঝা নামাতে চাই, কিন্তু ভুল অভ্যাস ও অসুস্থ নির্ভরতাগুলো ছাড়তে চাই না। মর্যাদা চাই, কিন্তু চরিত্র গঠন করতে চাই না। সাফল্য চাই; কিন্তু সাফল্যের পর কীভাবে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী থাকতে হয়, তা শিক্ষা গ্রহণ করি না।

সূরা আল-ইনশিরাহ আমাদের জানায়, প্রকৃত পুনর্গঠন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; এটি অন্তর, চিন্তা, কর্ম ও আকাঙ্ক্ষার সমন্বিত পরিবর্তন।

উপসংহার: কষ্টমুক্ত নয়, কষ্টজয়ী মানুষ চাই

সূরা আল-ইনশিরাহ এমন কোনো জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয় না, যেখানে আর কখনও দুঃখ, চাপ বা অনিশ্চয়তা আসবে না। বরং এটি এমন মানুষ গড়ে তোলে, যে কষ্টের মধ্যেও নিজের রবকে হারায় না; যে বোঝা অনুভব করার পরেও জানে, বোঝা নামানোর মালিক আছেন; যে মানুষের অবজ্ঞায় নিজের মূল্য ভুলে যায় না; যে অন্ধকারের মধ্যেও স্বস্তির সম্ভাবনা খোঁজে এবং যে একটি অধ্যায় শেষ হলে অর্থপূর্ণ নতুন অধ্যায় শুরু করে।

এই সূরার শিক্ষা তাই শুধু 'আশা রাখো' নয়। এর আহ্বান আরও বিস্তৃত—হৃদয়কে প্রশস্ত করো, অদৃশ্য বোঝাকে স্বীকার করো, আল্লাহর সাহায্যের সামনে নিজেকে সমর্পণ করো, মর্যাদার জন্য মানুষের দরজায় বন্দি থেকো না, কষ্টের ভেতরে লুকিয়ে থাকা স্বস্তিকে চিনতে শেখো, এক কাজ শেষে আরেক কল্যাণকর কাজে এগিয়ে যাও এবং সব আকাঙ্ক্ষার শেষ ঠিকানা বানাও একমাত্র আল্লাহকে।

জীবনের কঠিন সময়ে আমরা প্রায়ই জানতে চাই, 'এই কষ্ট কখন শেষ হবে?' সূরা আল-ইনশিরাহ আমাদের আরও গভীর একটি প্রশ্ন করতে শেখায়, 'এই কষ্টের মধ্য দিয়ে আল্লাহ আমাকে কেমন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছেন?'

সম্ভবত সব সংকটের উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় না। সব ক্ষতের কারণও মানুষের কাছে স্পষ্ট হয় না। কিন্তু মুমিনের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে যে, কষ্ট একা আসে না। তার সঙ্গে আল্লাহর রহমত থাকে, শিক্ষার দরজা থাকে, নতুন শক্তির সম্ভাবনা থাকে এবং থাকে রবের দিকে আরও গভীরভাবে ফিরে যাওয়ার আহ্বান।

অতএব, সূরা আল-ইনশিরাহ কষ্টমুক্ত জীবনের মানচিত্র নয়, বরং এটি কষ্টের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত হৃদয়ের মানুষ হয়ে ওঠার মানচিত্র। যে মানুষ ভেঙে পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে বিনয় শেখে, বোঝা থেকে নির্ভরতা শেখে, অপেক্ষা থেকে ধৈর্য শেখে এবং স্বস্তি লাভ করে কৃতজ্ঞ হতে শেখে।

সূরা আল-ইনশিরাহ তাই শুধু হতাশ মানুষের সান্ত্বনা নয়; এটি সংগ্রামরত মানুষের জন্য একটি জীবনদর্শন। শেষ পর্যন্ত সূরাটি মূলত সেই মানুষটিকেই নির্মাণ করে—যে সংকটে রবকে হারায় না, স্বস্তিতে রবকে ভুলে যায় না এবং জীবনের প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর হিকমত ও রহমতের উপর আস্থা রাখে।

বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা‘আতের সাথে যোগদান করার হুকুম

মূল: ড. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ
পরিমার্জন: সা‘দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুছায়্যিন
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-৭)

তৃতীয়ত: নবুঅতী মানহাজের আলোকে দাওয়াতের পর্যায়সমূহ:

ক. মহান আল্লাহর দিকে প্রকাশ্যে দাওয়াত পেশ করা: কালিমাতুত তাওহীদকে বাস্তবায়িত করা এবং মানুষের অন্তরে এর মৌলিক দাবি ও তাৎপর্যকে সুগভীরভাবে প্রোথিত করার লক্ষ্যে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে হবে। এটিই হচ্ছে দাওয়াতের অগ্রযাত্রার প্রারম্ভিক ভিত্তি এবং সুসংগঠিত হওয়ার মূল ভিত্তিস্তম্ভ। এটিই হচ্ছে সূচনা—যেমনটি নবী ﷺ তাঁর দাওয়াতের শুভ সূচনায় বলেছিলেন, قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا ‘তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তবেই তোমরা সফলকাম হবে’।

এটিই হচ্ছে শেষ ও চূড়ান্ত পরিণতি—যেমনটি নবী ﷺ-এর বাণীতে এসেছে, لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ‘তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু বা মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিদের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর তালকীন দাও’।

এর মধ্যে এই আত্মিক সত্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, একজন মুসলিমের সমগ্র জীবনপ্রবাহ তাওহীদ-এর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

তাওহীদই হচ্ছে কুরআনে কারীমে আদিষ্ট সর্বপ্রথম বিষয়—যেমনটি সূরা আল-বাক্বারার প্রারম্ভিক অংশে এসেছে, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ﴾ ‘হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো’ *(আল-বাক্বারাহ, ২/২১)*।

আর এর বিপরীত ও বিধ্বংসী রূপ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা— যা কুরআনে নিষিদ্ধ সর্বপ্রথম বিষয়; যেমনটি উপর্যুক্ত আয়াতটির পরবর্তী অংশে এসেছে, ﴿فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ‘সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিয়ো না’ *(আল-বাক্বারাহ, ২/২২)*।

কুরআনে আসা সর্বপ্রথম ক্রিয়াপদটি হচ্ছে ইবাদতকে কেবল আল্লাহর জন্য একচ্ছত্র ও একনিষ্ঠ করার ব্যাপারে। এরশাদ হয়েছে, ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ‘আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি’।

তাওহীদ হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূচনা এবং এটিই এর সমাপ্তি; যা মূলত এই কথারই সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, কুরআনের দুই মলাটের মাঝের সবকিছুই তাওহীদকে বাস্তবায়িত করার জন্য। তাওহীদ হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূচনা, যেমনটি সূরা আল-ফাতিহার শুরুতে এসেছে,- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ‘যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহরই জন্য। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু’ *(আল-ফাতিহা, ১/২-৩)*। এখানে ‘আল্লাহ’ শব্দটি তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (ইবাদতে আল্লাহর একত্ব)-এর দিকে ইঙ্গিত করে, ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ‘জগৎসমূহের রব’ শব্দটি তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ (প্রভুত্বে আল্লাহর একত্ব)-এর দিকে ইঙ্গিত করে এবং ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ‘যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু’ শব্দটি তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে একত্ব)-এর দিকে ইঙ্গিত করে।

শরী‘আতের অকাট্য দলীলসমূহের সামগ্রিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সুপ্রমাণিত তাওহীদের প্রকারভেদ এগুলোই।

আর তাওহীদই হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সমাপ্তি। (আল্লাহ বলেন,) ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ﴾ ‘বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের; মানুষের মালিকের’ *(আন-নাস, ১১৪/১-২)*। সুতরাং মহান আল্লাহ এখানে তাঁর রুবূবিয়্যাহ (প্রভুত্ব) ও উলূহিয়্যাহ (ইবাদত)-এর তাওহীদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর এই দুই প্রকার তাওহীদ আল্লাহর আসমা ওয়াছ-ছিফাত (নাম ও গুণাবলি) বিষয়ক তাওহীদের অপরিহার্য প্রমাণ বহন করে।

ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মান্য করাই হলো আল্লাহর নিজ সৃষ্টিকে সৃজন করার মূল লক্ষ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ‘আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি’ *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*। অর্থাৎ তারা ইবাদতে কেবল আমাকেই এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মানবে।

ইবাদতে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠাই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম-কে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ ‘আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক উম্মতের মাঝে

২.* বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

www.al-itisam.com

একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং ত্বাগূতকে বর্জন করো' *(আন-নাহল, ১৬/৩৬)*।

সুতরাং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তাৎপর্যকে পুনরুজ্জীবিত করা, এর অধিকারকে মানুষের অন্তরে গভীরভাবে বদ্ধমূল করা এবং এর পরিপন্থি ও বিধ্বংসী বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্ক করাই হলো সর্বপ্রথম কাজ এবং এটিই হলো সর্বশেষ কাজ। এটিই হচ্ছে জিন ও মানবজাতি সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম -এর প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্যও এটিই। এটিই কুরআনের সূচনা এবং এর সমাপ্তি। এটি কুরআনের সর্বপ্রথম নির্দেশ আর এর পরিপন্থি বিষয়গুলোকে বর্জন করা হলো কুরআনের সর্বপ্রথম নিষেধ। সুতরাং এর জন্যই দ্বীনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, কেবলা নির্ধারিত হয়েছে, জিহাদের তরবারি কোষমুক্ত হয়েছে এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে।

আর মহান আল্লাহর জন্য তাওহীদকে একনিষ্ঠ করার মাধ্যমে সঠিক আক্বীদা পোষণ করাই হলো উপকারী ইলম অর্জনের মূল মাধ্যম। পক্ষান্তরে এর অনুপস্থিতি হলো সত্য ও জ্ঞান থেকে বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ - وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ 'আর আমাদেরকে এর পূর্বেই জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা ছিলাম মুসলিম। আর আল্লাহ ব্যতীত সে যার ইবাদত করত, তা-ই তাকে (সঠিক পথ থেকে) নিবৃত্ত রেখেছিল' *(আন-নামল, ২৭/৪২-৪৩)*।

সুতরাং তার (রানি বিলকিসের) ইসলাম গ্রহণ ছিল জ্ঞান অর্জনের কারণ। পক্ষান্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত তাকে উপকারী জ্ঞান ও সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছিল।

মহান আল্লাহর জন্য তাওহীদকে একনিষ্ঠ করার মাধ্যমে সঠিক আক্বীদা পোষণ করা হলো ক্ষতি থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ। পক্ষান্তরে এর অনুপস্থিতি হলো ধ্বংসের গহ্বরে পতন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾ 'অতঃপর যখন আপনার রবের নির্দেশ আসল, তখন আল্লাহ ছাড়া তারা যেসব উপাস্যকে ডাকত, তারা তাদের কোনো কাজেই আসল না; বরং তারা কেবল তাদের ধ্বংসই বৃদ্ধি করেছিল' *(হূদ, ১১/১০১)*। বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের দিকে তাদের ইবাদতকে ফিরিয়ে দেওয়াকে তিনি তাদের ধ্বংস কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

অতএব, আল্লাহর দিকে দাওয়াতের সূচনা এবং তাঁর দ্বীন ও শরী'আতের দিকে আহ্বানের যাত্রার মূল ভিত্তি সর্বদা এই মহান বাক্য لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ থেকে হওয়া উচিত [যার অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই] এবং কিতাব ও সুন্নাহর অকাট্য দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এর দাবিগুলোকে গভীরভাবে প্রোথিত করা উচিত।

আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম -এর এই মানহাজ বা পদ্ধতির ওপরই এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মানুষগণ—ছাহাবীগণ এবং তাঁদের পরবর্তীরা—অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা ইসলামকে এর নিজস্ব বিশুদ্ধতা, আলো ও হেদায়াতসহ প্রচার করেছিলেন, যা সংশয় ও প্রবৃত্তির ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট নাম বা প্রতীকের মাধ্যমে ইসলামের মূল রেখা ও এর সরল পথ 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' থেকে নিজেদেরকে আলাদা করেননি। তাঁরা দাওয়াতের কেন্দ্রভূমি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে যাত্রা শুরু করে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু তাঁরা لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ -এর দাবির ওপরই ঐক্যবদ্ধ ও মিলিত ছিলেন।

ফলে দাঈদের ভিন্নতা এবং অঞ্চলসমূহের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাদের দাওয়াত ও এর ফলাফল এক ও অভিন্ন ছিল। আর একারণেই আপনি দেখতে পাবেন, সুন্নাহর আলেমগণ তাঁদের ভৌগোলিক অবস্থানের ভিন্নতা সত্ত্বেও সুন্নাহকে সাহায্য করার এবং বিদ'আতকে উন্মোচন করার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করেন। কেননা তাদের মিলের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হলো কিতাব ও সুন্নাহ। সুন্নাহর গ্রন্থগুলোর প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাত করলেই এটি জানা যায়, যার মধ্যে অন্যতম হলো ইমাম লালকাঈ প্রণীত 'শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ' (আহলুস সুন্নাহর আক্বীদার মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা)।

পক্ষান্তরে, দাওয়াত যদি বিভিন্ন দলের (দল-উপদল এবং জামা'আতসমূহের) নিজস্ব ছক বা প্রতীকের ওপর ভিত্তি করে হয়, তবে অবশ্যই সেখানে বিভাজন এবং মানহাজের ভিন্নতা পাওয়া যায়; যা দাওয়াতী ক্ষেত্রে তাদের সবকিছু উজাড় করে দিলেও নবুঅতের মানহাজের সাথে মেলে না। তাহলে একজন মুসলিম কোন মানহাজটি গ্রহণ করবে? আর আমাদের বর্তমান যুগের অবস্থার প্রেক্ষাপট খেয়াল করলে আপনি দেখতে পাবেন যে, আমি আপনাকে যা বলছি, তা একদমই ঠিক।

আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম -এর মানহাজ হলো- তাঁদের সকলেই এই বাণীর মাধ্যমে দাওয়াতের সূচনা করেছিলেন:﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; হূদ, ১১/৫০, ৬১, ৮৪)*।

এভাবেই যুগে যুগে শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও সর্বশেষ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দাওয়াতের মুজাদ্দিদ তথা সংস্কারকগণ সকলেই এই সুদৃঢ় ও সরল পথের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। যদিও সময়ের পরিক্রমায় নিত্যনতুন ঘটনা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং অঞ্চল বা ভূখণ্ডের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে; কিন্তু তাঁরা সকলেই ইবাদতে আল্লাহর একত্বের ঝান্ডা সমুন্নত করার মাধ্যমে, কালিমাতুল ইখলাছকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে এবং আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা থেকে সতর্ক করার মাধ্যমে

আর এর বাহ্যিক নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা ও এর সূক্ষ্ম রূপগুলো থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে দাওয়াতের সূচনা করেন। এভাবেই আল্লাহর দ্বীন ও শরী'আতের বিধানাবলি আক্বীদা, কথা ও কর্মে একের পর এক ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত হয়ে আসে।

গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, দাওয়াত যখনই এমন রূপ লাভ করে, তখনই এর অনুসারীগণ আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞানে সুগভীর হন এবং বিদ'আত ও গোমরাহকারী প্রবৃত্তি থেকে সুদূরবিচ্ছিন্ন থাকেন।

পক্ষান্তরে, যেসব ফেরকা (দল-উপদল ও জামা'আত) তাদের দাওয়াতী মানহাজে এই মূল ভিত্তির বাইরে গড়ে ওঠে, সেগুলো মূলত তাদের প্রতিষ্ঠাতার প্রত্যক্ষ করা শোচনীয় রাজনৈতিক বা চিন্তাগত পরিস্থিতির একটি প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই হয় না। সুতরাং প্রতিষ্ঠাতা যদি উছমানী খিলাফতের পতন প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তবে তিনি তাঁর দাওয়াতকে শাসনক্ষমতার দাবি তথা তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিষ্ঠাতা যদি মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তবে তিনি গ্রাম-গঞ্জে ও প্রান্তর-মরুভূমিতে বের হওয়ার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার ভিত্তির ওপর তাঁর দাওয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠাতা যদি সেই অভিশপ্ত ঢেউ তথা আল্লাহ সুবহানাহুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তবে তিনি মহান স্রষ্টা ও রিযিকদাতা রবের অস্তিত্ব প্রমাণের মাধ্যমে তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহকে বাস্তবায়িত করার ভিত্তির ওপর তাঁর দাওয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অতএব, যে কোনো দলের উত্থান ও সূচনালগ্নের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করুন, যাতে আপনি জানতে পারেন, তাদের দাওয়াত কোন মূল ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে। সুতরাং যা কিছু নবুওয়াতের মানহাজ অর্থাৎ তাওহীদের ঝান্ডা ছাড়া অন্য কিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে এমন এক দাওয়াতী মানহাজ হিসেবে গণ্য করুন— যা সরল পথের দুই প্রান্তে অবস্থিত এবং এর অনুসারীগণ মুসলিমদের জামা'আত-এর একটি অংশ হলেও তারা স্বয়ং 'মুসলিম জামা'আত' নয়। আর সাহায্যপ্রাপ্ত দল ও নাজাতপ্রাপ্ত দল-এর সাথে তাদের নৈকট্য বা দূরত্ব নির্ভর করে তাঁদের নিকট বিদ্যমান বা অনুপস্থিত নবুওয়াতের মানহাজ ও তার নূরের পরিমাণের ওপর।

তাহলে দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবুওয়াতের মানহাজের দিকে ফিরে আসার কি কোনো উপায় নেই?!

অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, দাওয়াতের সূচনার মাধ্যম কোনো ছূফী দল ছিল না, কোনো কালামী বা যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ছিল না, কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলও ছিল না; এগুলোর কোনো কিছুর মাধ্যমে তা শুরু হয়নি। বরং দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবুওয়াতের সূচনা হয়েছিল সর্বপ্রথম 'তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলিম' গড়ে তোলার মাধ্যমে।

এটিই হলো মূল ভিত্তি থেকে পরবর্তী বিষয়গুলোর দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতি; 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর প্রকৃত অধিকার ও দাবিসহ তাওহীদের এই ঝান্ডার দিকে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু হয়ে শরী'আতের অন্যান্য বিধানের দিকে দাওয়াতী কাজ চলবে। একজন মুসলিমের আক্বীদা যখন বিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং শিরক ও সংশয়ের ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র হয়ে যায়, তখন তার শরীর ও অন্তরে লেগে থাকা প্রবৃত্তি ও কামনার পঙ্কিলতাগুলো আপনাতেই ঝরে পড়ে।

পক্ষান্তরে, অন্তরসমূহ যখন সংশয়ের ব্যাধিতে বন্দী, তখন প্রবৃত্তির পঙ্কিলতা দূর করার মাধ্যমে দাওয়াত শুরু করা একটি স্বভাববিরুদ্ধ পদ্ধতি; শরী'আত একে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটি আম্বিয়ায়ে কেরামের মানহাজের বিপরীত। (মহান আল্লাহ বলেন,) ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ 'কাজেই আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ চেহারাকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আল্লাহর ফিতরাত (দ্বীন ইসলাম), যার উপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না' *(আর-রূম, ৩০/৩০)*।

সঠিক ভিত্তি তৈরি করার পূর্বেই নেতৃত্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বা চূড়ান্ত পর্যায় নিয়ে ভাবা মূলত এক শূন্যতা থেকে সূচনা মাত্র, যা এক দিক থেকে খারেজীদের পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এর পরিণতি হলো ফিতনা ও অকল্যাণ।

সারসংক্ষেপ হলো, বিচ্ছিন্ন মানুষকে একত্রিত করার এবং মতভেদকারীদের মাঝে সুসম্পর্ক ও প্রীতি তৈরি করার প্রকৃত বন্ধন হলো- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'[৩]-এর বন্ধন। আপনি কি দেখেন না যে, এটিই সেই বন্ধন, যা মুসলিমদের পুরো জামা'আতকে একটি দেহের মতো বানিয়ে দেয় এবং একে একটি সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো সুসংহত করে, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। আর এটিই আরশ বহনকারী ও এর চারপাশের ফেরেশতাদের অন্তরকে যমীনের বনূ আদমের প্রতি দয়ার্দ্র ও অনুরাগী করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ - رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

৩. অর্থাৎ সেই সঠিক অর্থ অনুযায়ী, যা দিয়ে সমস্ত রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল: اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই'। [আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই]।

www.al-itisam.com

‘যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তার উপর ঈমান রাখে, আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের রব! আপনি দয়া ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথ অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি হতে আপনি তাদের রক্ষা করুন। হে আমাদের রবা! আর আপনি তাদেরকে প্রবেশ করান স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে, তাদেরকেও। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আপনি তাদেরকে অপরাধের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। সেদিন আপনি যাকে (অপরাধের) খারাপ পরিণতি হতে রক্ষা করবেন, তাকে অবশ্যই অনুগ্রহ করবেন; আর এটাই মহাসাফল্য!’ *(গাফির, ৪০/৭-৯)*।

এখানে মহান আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন যে, আরশ বহনকারী ও তার চারপাশের ফেরেশতা এবং যমীনের বনূ আদমের মাঝে যে বন্ধনটি যুক্ত করেছে— যার কারণে তারা আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য এই বিরাট দু‘আ করেছিলেন—তা হলো কেবল আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান। কারণ তিনি ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেছেন, ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ ‘আর তারা তাঁর ওপর ঈমান আনে’। এখানে তিনি ফেরেশতাদেরকে ঈমানের গুণে ভূষিত করেছেন। আর তিনি ফেরেশতাগণ কর্তৃক মানুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে বলেছেন, ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ‘আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে’। এখানে তিনি বনূ আদমকেও ঈমানের গুণে ভূষিত করেছেন। অতএব, এটি প্রমাণ করে যে, তাঁদের মধ্যকার বন্ধনটি হলো ঈমান, আর এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধন; যেহেতু প্রত্যেকেই ইবাদত ও কামনায় একমাত্র আল্লাহর অভিমুখী হয়।

মোটকথা: মুসলিমদের মাঝে এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের পরস্পরকে একে অপরের সাথে যুক্ত করার বন্ধন এবং পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীদের মধ্যকার সুদৃঢ় বন্ধন হলো: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর বন্ধন। সুতরাং এটি ছাড়া অন্য কোনো বন্ধনের দিকে আহ্বান করা কখনোই বৈধ নয়।[৪]

জামা‘আতুল মুসলিমীন বা মুসলিমদের জামা‘আত-এর জন্য এই বন্ধনটি কেবল এমন যোগ্য আলেমের হাত ধরেই সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব, যিনি তাদের মাঝে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর আবশ্যকীয় দাবিগুলোকে সমুন্নত ও পুনরুজ্জীবিত করেন।

মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াতের এই বিরাট স্তরটি মুসলিমরা দুইভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেন:

প্রথমত: শাহাদাতাইনের দাবি অনুযায়ী ইবাদতের সমস্ত প্রকারকে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত করার মাধ্যমে ‘তাওহীদ বাস্তবায়ন’-এর জন্য কাজ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে যেকোনো প্রকারের ইবাদত নিবেদনের ফলে মুসলিমদের তাওহীদের আক্বীদায় শিরকের যে ময়লা-আবর্জনা লেগেছে, তা দূর করে তাওহীদের আক্বীদাকে পরিশুদ্ধ করা। দু‘আ, উদ্ধার প্রার্থনা, সাহায্য প্রার্থনা, ভয়, আশা এবং সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া ইত্যাদি সব ইবাদতের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত: কাফেরদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া; অন্যথা ইসলামের সুবিদিত নিয়মে জিহাদের ঝান্ডা সমুন্নত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ ‘আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়’ *(আল-বাক্বারাহ, ২/১৯৩)*। নবী ﷺ বলেন, لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ‘যাতে আল্লাহর বাণীই সর্বোচ্চ হয়’।[৫]

উল্লেখ্য, মুসলিমগণ হলেন প্রতিটি মুসলিম-এর মূলধন। সুতরাং পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপূজার কালিমামুক্ত করে তাদের আক্বীদাকে খাঁটি করা হলো ‘মূলধন রক্ষা’-এর অন্তর্ভুক্ত। আর কাফেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া হলো ‘মুনাফা’ অর্জনের অন্তর্ভুক্ত। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুনাফা অর্জনের চেয়ে মূলধন রক্ষা করা সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহই ভালো জানেন।

এটি ইসলামের সার্বজনীনতা অর্থাৎ সতর্কীকরণের মাধ্যমে সার্বজনীনতার অংশ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ - ‘হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন’ *(আল-মুদ্দাছছির, ৭৪/১-২)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ ‘সুতরাং আপনি বলুন, আমি তোমাদের সকলকে সমানভাবে সতর্ক করেছি’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/১০৯)*। নবী ﷺ বলেছেন, بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ ‘আমাকে লাল ও কালো (অর্থাৎ সমস্ত বর্ণ ও জাতের) মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে’।[৬]

আর রিসালাতের এই সার্বজনীনতা সুতদবিী। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ ‘আর আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই (সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে) প্রেরণ করেছি’ *(সাবা, ৩৪/২৮)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ‘বলুন, হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৫৮)*।

আর এই ভিত্তির ওপরই মক্কার প্রান্তরে দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল এবং এই ভিত্তির ওপরই নবী ﷺ মদীনায় তাঁর হিজরতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন -মহান আল্লাহ এই উভয় নগরীকে রক্ষা করুন-।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

৪. আযওয়াউল বায়ান, ৩/৪৪৭-৪৪৮ (সংক্ষেপে)।

৫. বুখারী ও মুসলিম।

৬. ছহীহ মুসলিম।

www.al-itisam.com

সালাফদের অমিয় বাণী

মূল: আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর হাফিযাহুল্লাহ
অনুবাদ: রিফাত সাঈদ*

ভূমিকা:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যিনি সকল প্রশংসার একমাত্র যোগ্য। অজস্র ধারায় ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সকল ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সালাফগণের কথায় রয়েছে মহান বরকত। তাদের জ্ঞানের গভীরতা ছিল অপরিসীম। তারা কৃত্রিমতাকে অপছন্দ করতেন এবং তারা ছিলেন সুন্দর উপদেশ ও সুদূরপ্রসারী দূরদৃষ্টির অধিকারী।

অতএব, বক্ষ্যমাণ সংকলনটি সালাফগণের বর্ণিত আছারসমূহ নিয়ে সংকলিত হয়েছে এবং প্রতিটি আছারের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত টীকাও সংযোজিত হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে আমরা সরল পথ, সঠিক কর্মপন্থা এবং নির্ভেজাল জ্ঞানের সন্ধান পাব। পাশাপাশি এতে রয়েছে মর্মস্পর্শী হিতোপদেশ ও পরিণত প্রজ্ঞাপূর্ণ নছীহতের সন্ধান।

কাজেই যে ব্যক্তি তাদের জীবনধারা অনুসরণ করে, সে সফলতার রাজপথে অগ্রসর হয়। আর যে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে, সেও সফলতার পথে অগ্রসর হয়।

আল্লাহ তাআলার সমীপে একনিষ্ঠ নিবেদন এই যে, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের আলোকিত আদর্শে আদর্শিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করেন এবং তাদের মজবুত চেতনা ধারণ করে তাদের সোনালি মানহাজ অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা এবং উত্তম সাড়াদানকারী।

১. সার্বজনীন উপদেশ

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন, আমাকে পুরো জ্ঞানের সমষ্টিস্বরূপ কিছু লিখে পাঠান। তিনি উত্তরে লিখলেন, নিশ্চয়ই জ্ঞান অনেক! কিন্তু তুমি যদি পার, তাহলে কারও প্রতি যুলুম করো না, হারাম ভক্ষণ করো না, মানুষকে অপমানজনক কথা বলো না এবং গীবত করো না। পাশাপাশি তাদের জামাআত বা ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না, যেন তুমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ (মৃত্যুবরণ) করতে পার। বাস্তবিকপক্ষে, এভাবেই তুমি জীবনযাপন করো।[৮]

আল্লাহু আকবার! অল্প কয়েকটি কথার মধ্যেই মানুষের সার্বিক অধিকার ও উত্তম চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিহিত রয়েছে। অথচ এসব বিষয়ে আমাদের কতই না অবহেলা! বিশেষ করে যখন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন আমাদের এই অবহেলা আরও বেড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এসব থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

২. মরীচিকার পেছনে ছুটো না!

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, দুনিয়া অতি দ্রুত বিদায় নিচ্ছে, আর আখেরাতও অতি সন্নিকটে। উভয়েরই সন্তান রয়েছে। কাজেই তোমরা আখেরাতের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হও; দুনিয়ার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। কারণ দুনিয়াতে আমল করার সুযোগ রয়েছে, কোনো প্রকার হিসাব নেই। আর আখেরাতে শুধু হিসাবের পালা, আমল করার কোনো সুযোগ নেই।[৯]

উক্ত বাণীর বাস্তব প্রেক্ষাপটে প্রাজ্ঞজনেরা বলেছেন, চরম আশ্চর্যের বিষয়! দুনিয়া তো বিদায় নিচ্ছেই, আবার আখেরাতও অতি সন্নিকটে। তাহলে মানুষ কীভাবে আখেরাতের জন্য ছুটে না গিয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে ছুটছে?[১০]

৩. রক্তপাত থেকে সাবধান!

জুনদুব ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মানুষের দেহে প্রথম যে জিনিসটি পচে বা নষ্ট হয়ে যায়, তা হলো তার পেট। কাজেই যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে, পবিত্র ও হালাল ছাড়া হারাম কোনো কিছু সে ভক্ষণ করবে না, সে যেন তা-ই করার চেষ্টা করে। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে যে, এক আঁজলা পরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়েও তার এবং জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না, সে যেন অবশ্যই তা করে।[১১]

উক্ত উক্তিটি হালাল ভক্ষণে উৎসাহ প্রদান এবং রক্তপাত থেকে বিরত থাকার এক মহৎ উপদেশ। প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত, কলুষমুক্ত চেতনা, কল্যাণসন্ধানী মন এবং আন্তরিক ও খাঁটি হৃদয়ের অধিকারী না হলে এ ধরনের শত শত উপদেশও কোনো কাজে আসবে না। এ কারণেই অন্তর কলুষিত হওয়ার ফলে মানুষ রক্তপাতের ফাঁদে পড়ে এবং চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭* অধ্যয়নরত, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, বংশাল, ঢাকা।
৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/২১৬।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১৭, হাদীছের প্রাসঙ্গিকতায় উদ্ধৃত।
১০. ফাতহুল বারী, ১১/২৩৬।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৫২।

তারা খারেজীপনার মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালায়, মুসলিম পুরুষ ও শিশুদের এলোপাতাড়ি হত্যা করে এবং সমাজে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

৪. জটিল ও বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন থেকে সাবধান!

ইমাম আওযাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত করতে চান, তখন তিনি তাকে জটিল ও বিভ্রান্তিকর প্রশ্নে ব্যস্ত করে দেন—যেসব প্রশ্নের মাধ্যমে সে মানুষকে সমস্যায় ফেলে।[১২]

الأغاليط হলো অসুবিধা ও কষ্টে ফেলার উদ্দেশ্যে মানুষকে জটিল প্রশ্ন করা এবং বিচিত্র ও অস্বাভাবিক প্রশ্নের মধ্যে জড়িয়ে দেওয়া, যা চরম সংশয় সৃষ্টি করে। ফলে তীব্র ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ বৃদ্ধি পায়।

কাজেই যে ব্যক্তি কেবল অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, অথচ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সম্পর্কে জানার কোনো আগ্রহ নেই এবং দৈনন্দিন জীবনে আমল করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জ্ঞানও অর্জন করে না, সে মূলত অযথা সময় অপচয় করে এবং ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়!

৫. রামাযান মাসের জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করো!

জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন তুমি ছিয়াম রাখবে, তখন তোমার কান, চোখ ও জিহ্বাকেও মিথ্যা কথা ও অনর্থক কথা থেকে বিরত রেখে ছিয়াম করাও এবং প্রতিবেশী ও অধীনদের কষ্ট দিয়ো না। আর তোমার মধ্যে প্রশান্তি ও স্থিরতা থাকা উচিত। ছিয়াম রাখার দিন ও ছিয়াম না রাখার দিন যেন সমান না হয়।[১৩]

এটি রামাযানের জন্য প্রস্তুতির এক উজ্জ্বল চিত্র। কেননা আত্মার পরিশুদ্ধতা, অন্তরের পবিত্রতা, তাক্বওয়া অর্জন, পাপমুক্তি এবং হৃদয়, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সংশোধন করার জন্যই ছিয়ামের বিধান দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি এই বরকতময় মাস পেল, অতঃপর উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করে এর প্রভূত কল্যাণগুলো লুফে নিল, সে কতই না উত্তম কাজ করল!

আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক্ব দান করুন, যেন আমরা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মিথ্যা ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখতে পারি, শান্তি ও ধৈর্যের সঙ্গে ছিয়ামের পূর্ণতা দিতে পারি এবং যথাযথভাবে এর হক্ব আদায় করতে পারি। উপরন্তু, ছিয়াম রাখার দিন আর ছিয়াম না রাখার দিন যেন একই রকম না হয়; বরং ছিয়াম যেন আমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে।

১২. জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী লি-ইবনি আব্দিল বার্র, পৃ. ১০৮৭।
১৩. মুছান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, হা/৮৯৭৩।

৬. আদব বা শিষ্টাচার

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শিষ্টাচার দ্বীন ইসলামের দুই-তৃতীয়াংশ।[১৪]

আদব বা শিষ্টাচার এত মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো- এটি মানুষের একটি মহান চরিত্র, যা তাকে প্রশংসনীয় কথা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। তদুপরি, এর মাধ্যমে ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হয় এবং অনেক অকল্যাণ ও অনিষ্ট প্রতিহত হয়। এটি মানুষকে প্রতিটি মহৎ গুণ ও সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং সব ধরনের মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে রাখে।

কাজেই শিষ্টাচারই দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের সফলতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় এবং সৌভাগ্যের পরশপাথর।

৭. ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস

উমাইর ইবনু হাবীব আল-খাতমী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাসও পায়। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এর বৃদ্ধি ও হ্রাস কীভাবে হয়? তিনি বললেন, যখন আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি এবং তাঁকে ভয় করি, তখন ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর যখন আমরা গাফেল হয়ে যাই, তাঁকে ভুলে যাই এবং তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হই, তখনই ঈমান হ্রাস পায়।[১৫]

কাজেই যেসব কারণে মানুষের ঈমান বৃদ্ধি পায়, সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সেগুলো জানতে হবে, আঁকড়ে ধরতে হবে এবং সেগুলোর হেফাযত করতে হবে। একইভাবে, যেসব কারণে ঈমান হ্রাস পায়, সেগুলো থেকেও দূরে থাকতে হবে এবং সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এভাবেই মানুষ তার দ্বীন রক্ষা করতে এবং নিজের ঈমানকে সযত্নে সংরক্ষণ করতে পারবে।

৮. মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করো না!

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আলেমদের তুচ্ছজ্ঞান করে, তার পরকাল নষ্ট হয়। যে শাসকদের অবজ্ঞা করে, তার দুনিয়া ধ্বংস হয়। আর যে ব্যক্তি তার বন্ধুদের অবহেলা করে, তার ব্যক্তিত্ব ও মানবিকতা বিনষ্ট হয়।[১৬]

মানুষের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকানো অহংকার ও আত্মম্ভরিতার প্রকাশ। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করেন না। কাজেই যে ব্যক্তি মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তার পরিণতি শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ হয়।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

১৪. ছিফাতুছ ছফওয়াহ লি-ইবনিল জাওযী, ৪/১৪৫।
১৫. মুছান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ, হা/১৪।
১৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৫/৪২৪।

পরিবারে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা: তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

-নাজমুস সাকিব বিন আব্দুর রাজ্জাক*

ভূমিকা: সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ও জীবনের প্রশান্তি

পরিবার কেবল রক্ত ও সম্পর্কের বন্ধন নয়; বরং এটি মানবসমাজের সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস, যার স্থিরতা ও সুস্থতার উপর নির্ভর করে একটি জাতির উত্থান-পতন, নৈতিকতা এবং মানবিকতার ভবিষ্যৎ। ইসলামী জীবনদর্শনে পরিবারকে শুধু একটি সামাজিক চুক্তি হিসেবে দেখা হয়নি, বরং এটিকে গণ্য করা হয়েছে ইবাদতের প্রথম ভিত্তিভূমি এবং আল্লাহর আমানত (দায়িত্বপূর্ণ অর্পণ) হিসেবে।

যখন সমাজে অস্থিরতা ও নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়, তখন বুঝতে হবে যে, এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেছে। পরিবার যদি আল্লাহর দেখানো পথে পরিচালিত না হয়, তবে সমাজের বৃহত্তর কাঠামোর পতন অনিবার্য। এ কারণেই কুরআনুল কারীম পরিবারকে 'সাকান' বা 'প্রশান্তির স্থান' হিসেবে ঘোষণা করেছে। কুরআনে এসেছে, ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ 'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে করেছেন প্রশান্তির স্থান' *(আন-নাহল, ১৬/৮০)*।

এই প্রশান্তি কেবল বাহ্যিক আরাম নয়; বরং এটি আত্মিক নিরাপত্তা, মানসিক স্থিতি এবং নৈতিক নির্ভরতার নিশ্চয়তা। আর এই প্রশান্তির মূল সূত্র নিহিত রয়েছে ইসলামী আদর্শের নিবিড় অনুসরণে।

ইসলামী আদর্শের মর্মার্থ ও পারিবারিক ভিত্তি:

'ইসলামী আদর্শ' কোনো গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশিত পথ, যা কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পরিবারে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির মানদণ্ডে পরিচালিত ও মূল্যায়ন করা। পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ 'আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা (মাওয়াদ্দা) ও দয়া (রহমাহ) স্থাপন করেছেন' *(আর-রূম, ৩০/২১)*।

এই আয়াতে বর্ণিত মাওয়াদ্দা (গভীর ভালোবাসা) ও রহমাহ (করুণা ও দয়া) ইসলামী পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিস্তর। মাওয়াদ্দা যেখানে সম্পর্কের প্রাণশক্তি ও প্রেরণা, সেখানে রাহমাহ হলো সেই রক্ষাকবচ, যা জীবনের কঠিনতম সময়েও পারস্পরিক বন্ধনকে অটুট রাখে। এই আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হয় তাক্বওয়ার দৃঢ় বন্ধন, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং একে অপরের হক্ব (অধিকার) আদায়ে গভীর সচেতনতা।

নবী ﷺ-এর পরিবার: সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র

ইসলামী আদর্শের বাস্তব রূপ দেখতে হলে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের দিকে। তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল মানবজাতির জন্য এক চিরন্তন উসওয়াতুন হাসানাহ (উত্তম আদর্শ)। তিনি তাঁর পরিবারে কেবল একজন নবী বা রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন সহমর্মী স্বামী, স্নেহময় পিতা এবং গৃহের একজন সক্রিয় সদস্য। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারে (অর্থাৎ গৃহস্থালি কাজে) সাহায্য করতেন'।[১৮]

এই হাদীছ আমাদের শেখায় যে, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা মানে শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদত নয়; বরং এটি দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ছোট কাজে বিনয়, সহযোগিতা ও ভালোবাসার প্রতিফলন। ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-ও তাদের পরিবারে এই আদর্শের বীজ বপন করেছিলেন, যেখানে পার্থিব আরামের চেয়ে আখেরাতের সফলতা অর্জনই ছিল মূল লক্ষ্য।

ইসলামী পরিবারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ:

ইসলামী পরিবার গঠনে প্রতিটি সদস্যের উপর অর্পিত হয়েছে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব, যা পালনের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব।

১. অভিভাবকত্বের আমানত ও পারস্পরিক পোশাকস্বরূপতা: ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এই সম্পর্ক কেবল বৈবাহিক বন্ধন নয়; বরং এটি পারস্পরিক দায়িত্ব, ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও আস্থার এক পবিত্র অঙ্গীকার। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের জন্য সহযোগী এবং রক্ষাকবচস্বরূপ। তারা পরস্পরের সুখ-দুঃখের সাথি, দুর্বলতার আড়ালকারী এবং কল্যাণের সহযাত্রী। কুরআন ঘোষণা করেছে, ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ 'তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক' *(আল-বাকারা, ২/১৮৭)*।

১৭* রানীগঞ্জ বাজার, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

১৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৩৯।

www.al-itisam.com

‘পোশাক’ যেমন আমাদের সতর (গোপনীয়তা) রক্ষা করে, আমাদের ত্রুটি ঢেকে রাখে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; তেমনি স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন, প্রয়োজনে পরামর্শ দেবেন এবং সম্পর্কের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা রক্ষা করবেন। এই সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো ইনছাফ (ন্যায়বিচার) ও ইহসান (উত্তম আচরণ)।

২. সন্তানদের তারবিয়্যাহ (সমন্বিত প্রতিপালন): পিতা-মাতার প্রধানতম দায়িত্ব হলো তাদের সন্তানদের শুধু শারীরিক ও মানসিকভাবে নয়; বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ করে গড়ে তোলা। সন্তানের সঠিক ইসলামী শিক্ষা প্রদান শুধু দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর নয়; এটি পিতা-মাতার জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (চলমান দান)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ‘তোমাদের প্রত্যেকে একজন দায়িত্বশীল রাখাল, আর প্রত্যেকে তার দায়িত্বাধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে’।[১৯]

এই দায়িত্বশীলতা কেবল অর্থনৈতিক ভরণপোষণ নয়; বরং তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা এবং উত্তম চরিত্রে ভূষিত করা। সন্তানেরা যেন দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের প্রতি সমানভাবে সচেতন থাকে তার ব্যবস্থা করা।

৩. ইবাদতের পরিবেশ ও দাওয়াতী কাজ: পরিবারের মধ্যে নিয়মিত ইবাদতের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী আদর্শের মূল স্তম্ভ। বিশেষ করে ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলা ফরয দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন, ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ ‘তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং নিজেও তা ধৈর্য সহকারে পালন করো’ *(ত্বা-হা, ২০/১৩২)*।

পরিবারকে এমন একটি ছোট মসজিদে পরিণত করতে হবে, যেখানে আল্লাহর স্মরণ (যিকির), সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ (আমর বিল মা‘রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার)-এর অনুশীলন সর্বদা বিদ্যমান থাকে।

ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুতির ভয়াবহ পরিণতি:

যে পরিবারে ইসলামী আদর্শের আলোকবর্তিকা নিভে যায়, সেই পরিবারে ধীরে ধীরে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। ধর্মীয় দায়িত্বের প্রতি উদাসীনতা পারিবারিক জীবনে নৈতিক অবক্ষয়, মানসিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর কয়েকটি প্রধান ফলাফল হলো—

১. নৈতিক মেরুদণ্ডহীনতা: সন্তানসন্ততি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর ভয় থেকে দূরে সরে গিয়ে ভোগবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

২. দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন: মাওয়াদ্দা ও রহমাহ-এর পরিবর্তে স্বার্থপরতা ও অধিকার আদায়ের দ্বন্দ্বে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে, যার চূড়ান্ত ফল তালাক ও বিচ্ছেদ।

৩. সামাজিক বিপর্যয়: দুর্বল পরিবার সমাজের দুর্বলতা বৃদ্ধি করে। রাসূল ﷺ-এর সতর্কবাণী এখানে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, তিনি বলেন, إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ‘যখন দায়িত্ব (আমানত) নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো’।[২০]

পরিবার হলো এই আমানতের প্রথম ক্ষেত্র। এই আমানত নষ্ট হলে, বৃহত্তর সমাজও তার নৈতিক দায়িত্ববোধ হারায় এবং ক্বিয়ামতের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়।

ইসলামী পরিবার গঠনে সার্থক পদক্ষেপ:

একটি শক্তিশালী ও আদর্শিক পরিবার গঠনের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট ও সচেতন পদক্ষেপ।

১. দৈনিক কুরআন চর্চা: পরিবারের সকলকে নিয়ে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত এবং এর অর্থ বোঝার জন্য সাপ্তাহিক বা মাসিক দারসের (আলোচনা চক্র) আয়োজন করা।

২. ঐক্যবদ্ধ ইবাদত: সম্ভব হলে জামাআতের সাথে ঘরে ফজরের ছালাত আদায় করা এবং আল্লাহর যিকির ও দু‘আ করা।

৩. পর্দা ও শালীনতা: ঘরে ও বাইরে ইসলাম নির্দেশিত পর্দা ও শালীনতা কঠোরভাবে বজায় রাখা।

৪. ক্ষমা ও সহনশীলতার সংস্কৃতি: ছোটখাটো ভুলত্রুটি মানবিক হিসেবে গ্রহণ করা এবং ক্ষমা ও দয়ার মাধ্যমে সম্পর্ককে মযবূত করা।

৫. সন্তানের জন্য দ্বীনী উদাহরণ: পিতা-মাতা নিজেদের জীবনে দ্বীন পালনের মাধ্যমে সন্তানদের জন্য সর্বোত্তম মডেল (Role Model) তৈরি করা।

উপসংহার:

পরিবারে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা নিছক একটি ঐচ্ছিক কাজ নয়; বরং এটি ঈমানের আবশ্যিক দাবি এবং জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। যে পরিবারে আল্লাহর বিধান কার্যকর হয়, সেই পরিবারই দুনিয়ায় জান্নাতের প্রতিচ্ছবি এবং আখেরাতে মুক্তির সোপান। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ভয়ংকর পরিণতি থেকে সাবধান করেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো’ *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*।

অতএব, প্রতিটি মুসলিম পরিবারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেদের ঘরকে ইসলামী আদর্শের এক সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করা, যেখানে কেবল ইবাদতের মাধ্যমেই নয়; বরং প্রতিটি লেনদেন, আচরণ, পারস্পরিক ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং শিক্ষাদানের মধ্য দিয়েও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এমন পরিবারে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় এবং তাক্বওয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও উত্তম চরিত্রের বিকাশ ঘটে। আল্লাহ আমাদের আদর্শ পরিবার গঠনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

১৯. ছহীহ বুখারী, হা/৮৯৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২৯।

২০. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯৬।

www.al-itisam.com

বই থেকে স্ক্রিন: একটি জাতির নীরব পতন

-আব্দুল গাফফার মাদানী*

(পর্ব-২)

সালাফদের জীবনে বই ও জ্ঞানচর্চা: সালাফে ছালেহীন জ্ঞান অর্জনের জন্য অকল্পনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। একজন মুহাদ্দিছ একটি হাদীছ সংগ্রহের জন্য শত শত কিলোমিটার সফর করেছেন।[২২] কেউ রাতভর প্রদীপ জ্বালিয়ে অধ্যয়ন করেছেন, কেউ নিজের সম্পদ বিক্রি করে বই সংগ্রহ করেছেন।[২৩] তাদের কাছে বই অলংকার বা সাজিয়ে রাখার বিষয় ছিল না, ছিল জীবনসঙ্গী। এই কারণেই তাদের রচিত গ্রন্থগুলো আজও পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়।

বইবিমুখতা ও ভ্রান্তির বিস্তার: যখন মানুষ মূল গ্রন্থ পড়া ছেড়ে দেয়, তখন সে অন্যের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, কাটাছেঁড়া ভিডিও বা যাচাইহীন তথ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মায়। ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিদআতের প্রসার ঘটে। গুজব ও বিভ্রান্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তির পরিবর্তে আবেগ প্রাধান্য পায়। অনুরূপভাবে আলেমদের পরিবর্তে জনপ্রিয় বক্তা বা 'ভাইরাল' ব্যক্তিরা মতামতের উৎস হয়ে ওঠেন। এটি একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতার স্পষ্ট লক্ষণ।

প্রকাশনা শিল্পের সংকট: আসলে প্রকাশনা শিল্পের সংকট মানে প্রকারান্তরে একটি সভ্যতার সংকট। বই বিক্রি কমে যাওয়া কেবল ব্যবসায়িক সমস্যা নয়, এটি একটি সভ্যতার সংকট। আজ বহু প্রকাশক অভিযোগ করেন, আগের তুলনায় পাঠক কমেছে। অনেক বইয়ের প্রথম সংস্করণ শেষ হতে বছরের পর বছর লেগে যাচ্ছে। কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম সীমিত করেছে, আবার কিছু প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন লেখকরা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন, কারণ গবেষণাভিত্তিক বইয়ের পাঠকসংখ্যা কমে যাচ্ছে। যে সমাজে বই বিক্রি কমে যায়, সেখানে কিছুদিন পর চিন্তাবিদ, গবেষক ও মানসম্পন্ন লেখকের সংখ্যাও কমতে শুরু করে। আর যখন চিন্তাবিদ কমে যায়, তখন সেই সমাজ অন্যের চিন্তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির সহজলভ্যতা আমাদের পাঠাভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

একসময় কোনো বই পড়তে হলে তা সংগ্রহ করে কিনতে হতো, কিন্তু এখন একটি স্মার্টফোনের পর্দায় কয়েক মুহূর্তেই হাজারো বইয়ের পিডিএফ (PDF) বা অনলাইন কপি পাওয়া যাচ্ছে। ফলে মুদ্রিত বই কেনার প্রবণতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। বিশেষত বিনামূল্যে বা অতি সহজে পাওয়া পিডিএফ কপির প্রতি আমাদের এক ধরনের নির্ভরতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে পাঠক যেমন ধীরে ধীরে বই কেনার অভ্যাস হারাচ্ছেন, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লেখক, প্রকাশক, মুদ্রণশিল্প ও বই বিক্রির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরো একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

সম্মানিত পাঠক! একটু ভেবে দেখুন তো, আপনি নিজে কয়টি বই কিনে পড়েছেন?

বিষয়টি শুধু বই বিক্রি কমে যাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব জ্ঞানচর্চার উপরও পড়ছে। স্ক্রিনে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে মাইগ্রেনসহ বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়, ধীরে ধীরে মনোযোগহীনতা তৈরি হয়। আসল বই এবং পিডিএফ বইয়ের মাঝে তথ্য গ্রহণের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা একটা বড় ফারাক। তাছাড়াও একজন লেখক দীর্ঘ সময়, শ্রম ও গবেষণা ব্যয় করে একটি বই রচনা করেন। তারপর প্রকাশক সম্পাদনা, মুদ্রণ, বাঁধাই, বিপণন ও বিতরণের পেছনে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেন। কিন্তু সেই বই প্রকাশের পর যদি তা অবৈধভাবে স্ক্যান করে পিডিএফ আকারে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পাঠক বই না কিনে সেটিই ব্যবহার করেন, তাহলে লেখক ও প্রকাশক উভয়েই তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হন। দীর্ঘমেয়াদে এর ফলে মানসম্মত বই প্রকাশের আগ্রহ ও সক্ষমতা কমে যেতে পারে।

তাই প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি আমাদের পাঠসংস্কৃতি ও প্রকাশনা শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও সচেতন হওয়া জরুরী।

২১* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
২২. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬০৪২, ১৬০৪৩।
২৩. জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, লি-ইবনে আব্দিল বার্র, ১/৪১০।

ফিরে আসার সময় এখনই: আজ মুসলিম উম্মাহ যদি আবার জ্ঞানে, নৈতিকতায় ও নেতৃত্বে অগ্রসর হতে চায়, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি উপকারী বই পড়াকে পুনর্জীবিত করতেই হবে। ঘরে ঘরে ছোট লাইব্রেরি গড়ে তুলতে হবে, সন্তানদের হাতে স্ক্রিনের আগে বই তুলে দিতে হবে এবং সমাজে পাঠাভ্যাসকে সম্মানের সংস্কৃতিতে পরিণত করতে হবে। কারণ ইতিহাসের একটি সত্য কখনও বদলায় না, তা হলো- যে জাতি বইকে সম্মান করে, ভবিষ্যৎ তারই হাতে থাকে। আর যে জাতি বইকে ভুলে যায়, ইতিহাসও একদিন তাকে ভুলে যায়।

মুসলিমদের স্বর্ণযুগ তথা যখন বই-ই ছিল সভ্যতার ভিত্তি: আজ আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন অনেকেই মনে করেন, মুসলিমরা শুধু ধর্মীয় জ্ঞানেই অগ্রসর ছিল; বিজ্ঞান, গবেষণা ও সভ্যতা নির্মাণে তাদের অবদান সীমিত। অথচ ইতিহাস এই ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এক সময় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার, সবচেয়ে সমৃদ্ধ গবেষণাকেন্দ্র, সবচেয়ে বেশি বইয়ের বাজার এবং সর্বাধিক জ্ঞানচর্চার পরিবেশ ছিল মুসলিমদের হাতে। কুরআনের 'ইক্বরা'-এর আহ্বান শুধু মসজিদেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং জ্ঞানচর্চার প্রতিটি অঙ্গনে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ 'আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা বহু স্তরে উন্নীত করবেন' *(আল-মুজাদালাহ, ৫৮/১১)*। এ আয়াত মুসলিমদের শুধু ইবাদতের নয়, জ্ঞানচর্চারও অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

আজকের বাস্তবতা: আমরা কোথায়? আজ মুসলিম বিশ্বের বহু ঘরে দামি স্মার্টফোন আছে, কিন্তু একটি ছোট ব্যক্তিগত লাইব্রেরি নেই। মাসে হাজার হাজার টাকা মোবাইল, পোশাক কিংবা বিনোদনের জন্য ব্যয় করা হলেও বছরে একটি ভালো বই কেনার মানসিকতা অনেকের মধ্যে দেখা যায় না। অনেকে শত শত অনলাইন পোস্ট পড়েন, কিন্তু একটি মৌলিক তাফসীর, হাদীছের গ্রন্থ বা ইসলামী গবেষণার বই সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করতে পারেন না। এটি কেবল পাঠাভ্যাসের দুর্বলতা নয়, এটি চিন্তার গভীরতা হারানোর লক্ষণ।

স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনার পথ: মুসলিমদের হারানো গৌরব কেবল আবেগ, স্লোগান বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিতর্ক দিয়ে ফিরে আসবে না। বরং তা ফিরে আসবে— (১) কুরআনের আলোকে জ্ঞানচর্চা পুনর্জীবিত করার মাধ্যমে। (২) বই পড়াকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করার মাধ্যমে। (৩) গবেষণাকে ইবাদতের অংশ হিসেবে দেখার মাধ্যমে। (৪) লেখক, গবেষক ও প্রকাশকদের সম্মান ও সহযোগিতা করার মাধ্যমে। (৫) শিশুদের হাতে খেলনা বা মোবাইলের আগে বই তুলে দেওয়ার মাধ্যমে। (৬) পরিবার ও সমাজে পাঠসংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে উম্মাহ 'ইক্বরা' দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, তারা বইয়ের মাধ্যমে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। আর আজ যদি সেই উম্মাহ পুনরায় নেতৃত্ব ফিরে পেতে চায়, তবে তাকে আবারও কুরআন, সুন্নাহ, কলম ও বইয়ের কাছেই ফিরে আসতে হবে।

স্ক্রিনের নেশা: আজকের পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই একটি পুরো প্রজন্মকে দুর্বল করে দেওয়ার সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্রগুলোর একটি হলো অতিরিক্ত স্ক্রিন-নির্ভর জীবন। এই আসক্তি চোখে দেখা যায় না; কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের সময়, মনোযোগ, চিন্তাশক্তি, ইবাদত, পারিবারিক সম্পর্ক এবং জ্ঞানচর্চাকে গ্রাস করে ফেলে। এটি শুধু একটি প্রযুক্তিগত সমস্যা নয়; বরং এটি একটি নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক সংকট।

একজন মানুষ যদি প্রতিদিন মাত্র ৩ ঘণ্টা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যয় করেন, তবে বছরে প্রায় ১,১০০ ঘণ্টারও বেশি সময় সেখানে চলে যায়। এই সময়ে একজন মানুষ পবিত্র কুরআন বহুবার তিলাওয়াত করতে পারেন, শতাধিক মানসম্মত বই পড়তে পারেন, একটি নতুন ভাষা শিখতে পারেন, অথবা একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে এই মূল্যবান সময়ের বড় অংশ ক্ষণস্থায়ী বিনোদনে হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় পাঠক! অবহেলায় কাটিয়ে দেওয়া এই সময়ের জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ 'ক্বিয়ামতের দিন কোনো বান্দার উভয় পা (আল্লাহর সামনে থেকে) একটুও নড়তে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে তার জীবন সম্পর্কে, সে তা কোন কাজে নিঃশেষ করেছে'।[২৪] আজ এই হাদীছ আমাদের সামনে একটি কঠিন প্রশ্ন রেখে যায়, প্রতিদিনের অসংখ্য ঘণ্টার স্ক্রলিংয়ের হিসাব আমরা কীভাবে দেব?

২৪. তিরমিযী, হা/২৪১৭, 'হাসান ছহীহ'।

স্ক্রিন আমাদের কী কেড়ে নিচ্ছে?

(১) বই পড়ার ধৈর্য: দীর্ঘ সময় ধরে বই পড়া এখন অনেকের কাছে কঠিন মনে হয়। কয়েক পৃষ্ঠা পড়লেই মন অন্যদিকে চলে যায়। কারণ মস্তিষ্ক দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্য ও ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

(২) গভীর চিন্তাশক্তি: গভীর চিন্তা কখনও তাড়াহুড়ো করে হয় না। একটি ভালো বই মানুষকে থামতে শেখায়, ভাবতে শেখায় এবং প্রশ্ন করতে শেখায়। কিন্তু দ্রুতগতির কনটেন্ট মানুষকে ভাবার সুযোগই দেয় না। আল্লাহ তাআলা বহুবার প্রশ্ন করেছেন, ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ 'তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না?' *(আন-নিসা, ৪/৮২)*। তাদাব্বুর (গভীর চিন্তা) এমন একটি আমল, যা ধীরস্থির মনোযোগ ছাড়া সম্ভব নয়।

(৩) ইবাদতের একাগ্রতা: অবিরাম নোটিফিকেশন, অন্তহীন ভিডিও আর তথ্যের কোলাহলে যে মন সারাক্ষণ চঞ্চল থাকে, ছালাতের শান্ত মুহূর্তে তার পক্ষে একাগ্র হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে অবধারিতভাবেই খুশূ-খুযূ কমে যায় এবং যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের সেই চিরায়ত ধৈর্য ও স্বাদ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

(৪) সম্পর্কের অবক্ষয়: একই ঘরে বসে পরিবারের প্রতিটি সদস্য যার যার ডিজিটাল স্ক্রিনে বুদ হয়ে আছে—এই দৃশ্য আজ আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। ফলে ফুরিয়ে আসছে হৃদয়ের কথোপকথন, শিথিল হচ্ছে পারিবারিক বন্ধনের সুতো। সন্তানরা আজ বাবা-মায়ের কাছ থেকে রূপকথার গল্প নয়, বরং উপহার হিসেবে পাচ্ছে প্রাণহীন ডিজিটাল স্ক্রিন।

(৫) জ্ঞানের পরিবর্তে তথ্যের ভিড়: আজ মানুষ আগের চেয়ে বেশি তথ্য জানে, কিন্তু আগের চেয়ে কম প্রজ্ঞাবান।

কারণ তথ্য (Information) আর জ্ঞান (Knowledge) এক নয়। তথ্য মুহূর্তেই পাওয়া যায়; কিন্তু জ্ঞান আসে অধ্যয়ন, চিন্তা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

স্ক্রিনের নেশা ও আত্মপ্রবঞ্চনা: অনেকেই বলেন, 'আমি তো ইসলামী ভিডিওই দেখি', 'আমি তো দাওয়াহর পোস্ট পড়ি'—এগুলো উপকারী হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এগুলো কি নিয়মিত কুরআন, হাদীছ, তাফসীর ও নির্ভরযোগ্য বই অধ্যয়নের বিকল্প হতে পারে? কখনোই নয়। একটি ৩০ সেকেন্ডের ভিডিও আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে; কিন্তু একজন আলেম, গবেষক বা সচেতন মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না।

মুসলিম উম্মাহর সামনে আজকের চ্যালেঞ্জ: আজ আমাদের সামনে দুটি পথ—একটি পথ আমাদের নিয়ে যায় অবিরাম স্ক্রল, বিনোদন, সময়ের অপচয় এবং চিন্তার অগভীরতার দিকে; অন্য পথটি নিয়ে যায় কুরআন, সুন্নাহ, বই, গবেষণা, জ্ঞানচর্চা এবং সভ্যতা নির্মাণের দিকে। দুই পথে একসঙ্গে দীর্ঘদিন চলা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি বইকে সময় দেয়, সে স্ক্রিনকে সীমিত করে। আর যে ব্যক্তি স্ক্রিনকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সময় দেয়, সে ধীরে ধীরে বই থেকে দূরে সরে যায়।

একটি আত্মসমালোচনার আহ্বান: আমাদের প্রত্যেকের নিজের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করা উচিত-

» গত এক বছরে আমি কতটি বই পড়েছি?
» গত এক বছরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কত ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি?
» আমার সন্তান আমাকে বই পড়তে বেশি দেখে, নাকি মোবাইল ব্যবহার করতে বেশি দেখে?
» আমার ঘরে কি একটি ছোট লাইব্রেরি আছে?
» সর্বশেষ কবে আমি একটি ইসলামী বই কিনেছি?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই আমাদের বর্তমান অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরবে।

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের ১০টি মৌলিক কারণ: কেন আমরা নেতৃত্ব হারালাম? ইসলাম পৃথিবীকে এমন এক জাতি উপহার দিয়েছিল, যারা জ্ঞান, ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সভ্যতায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু আজ মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চল রাজনৈতিকভাবে দুর্বল, শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে, গবেষণায় অনগ্রসর এবং অর্থনৈতিকভাবেও অন্যের উপর নির্ভরশীল। এ অবস্থা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়; বরং দীর্ঘদিনের অবহেলা, ভুল অগ্রাধিকার এবং কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(আর-রা'দ, ১৩/১১)*।

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, উত্থান-পতনের সূচনা মানুষের ভেতর থেকেই হয়। এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে—

১. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া: মুসলিমদের শক্তির প্রথম ভিত্তি ছিল আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ। যখন উম্মাহ এই দুই উৎসকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছিল, তখন তারা উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। আর যখন এগুলো কেবল তিলাওয়াত বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল, তখন দুর্বলতা শুরু হলো।

২. বই পড়ার অভ্যাস হারিয়ে ফেলা: একটি বই মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়, কিন্তু একটি ক্ষণস্থায়ী ভিডিও শুধু মুহূর্তের উত্তেজনা দেয়। আজ অনেকেই মাসে একটি বইও পড়েন না, অথচ প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রিনে কাটান। এর ফলে জ্ঞান কমছে, মতামত বাড়ছে।

৩. সময়ের অপচয়: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ 'দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন, তা হলো সুস্থতা ও অবসর'।[২৫] আজ অবসর সময়ের একটি বড় অংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যয় হচ্ছে, যা ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বাধা।

৪. দুনিয়াপ্রীতি ও আখেরাতবিমুখতা: রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের দুর্বলতার কারণ হিসেবে বলেছেন, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ 'দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা'।[২৬] যখন ভোগবিলাস, খ্যাতি ও বিনোদন জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে যায়; তখন জ্ঞান, ত্যাগ ও আদর্শ পিছিয়ে পড়ে।

৫. গবেষণা ও চিন্তার অবক্ষয়: ইসলাম শুধু মুখস্থ করার ধর্ম নয়, এটি চিন্তারও ধর্ম। আল্লাহ কুরআনে বহুবার বলেছেন, ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾'তারা কি বুদ্ধি ব্যবহার করে না?' (ইয়াসীন, ৩৬/৬৮)। তিনি আবার বলেন, ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ﴾ 'তারা কি গভীরভাবে চিন্তা করে না?' *(আন-নিসা, ৪/৮২)*। তিনি আরও বলেন, ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ 'যাতে তোমরা চিন্তা কর' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৯, ২৬৬)*।

অর্থাৎ বুঝা গেল, গবেষণা ছাড়া কোনো জাতি নেতৃত্ব দিতে পারে না।

৬. অগভীর জ্ঞান নিয়ে কথা বলার প্রবণতা: আজ অনেকেই একটি ছোট ভিডিও দেখে নিজেকে বিশেষজ্ঞ মনে করেন। অথচ সালাফদের যুগে একটি বিষয়ে কথা বলার আগে বছরের পর বছর অধ্যয়ন করা হতো। জ্ঞানহীন বক্তব্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং সমাজে মতভেদ বাড়ায়।

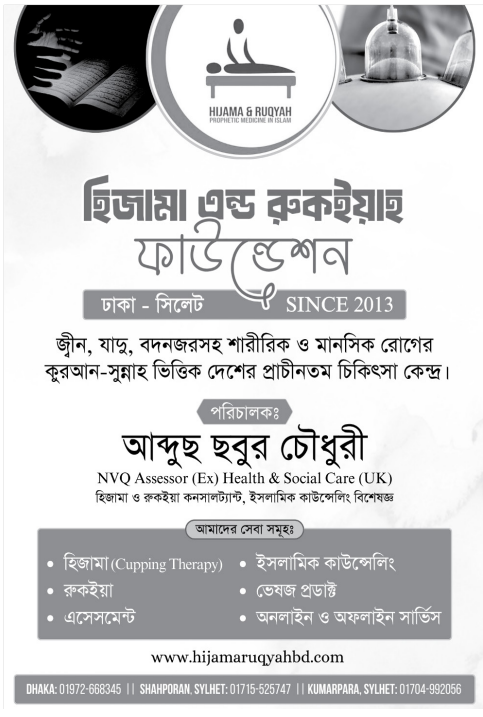
৭. আদর্শ মানুষের অভাব: একসময় যুবকদের আদর্শ ছিলেন ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ, ইবনু তায়মিয়্যাহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইমাম নববী রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ মনীষী। আজ অনেক তরুণের আদর্শ হয়ে উঠছে জনপ্রিয় বিনোদন ব্যক্তিত্ব বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবশালী মুখ। আর এটা তো জানা কথা যে, আদর্শ বদলে গেলে জীবনও বদলে যায়।

৮. পরিবারে পাঠসংস্কৃতির বিলুপ্তি: একটি শিশু বইপ্রেমী হয়ে জন্মায় না, বরং পরিবার তাকে বইপ্রেমী বানায়। যে ঘরে বই নেই, বই পড়ার পরিবেশ নেই, সেখানে পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে জ্ঞানচর্চার আশা করা কঠিন।

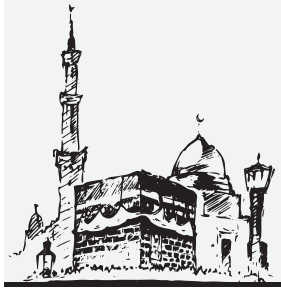
৯. লেখক ও প্রকাশকদের অবমূল্যায়ন: একটি জাতির চিন্তা গড়ে তোলেন তার আলেম, গবেষক, লেখক ও শিক্ষক। কিন্তু যখন তাদের শ্রমের মূল্যায়ন করা হয় না, বই বিক্রি কমে যায়, গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা থাকে না; তখন জ্ঞানচর্চাও দুর্বল হয়ে পড়ে।

১০. আত্মসমালোচনার অভাব: আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ 'হে প্রজ্ঞাবানরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো' *(আল-হাশর, ৫৯/২)*। যে জাতি নিজের ভুল বিশ্লেষণ করে না, সে কখনও উন্নতি করতে পারে না। আজ আমাদের প্রয়োজন অন্যকে দোষারোপ করা নয়; বরং নিজেদের প্রশ্ন করা, আমরা কতটা পড়ি, কতটা শিখি, কতটা গবেষণা করি এবং কতটা সময় অপচয় করি?

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)



২৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১২।
২৬. আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৭।



হারামাইনের মিম্বার থেকে

প্রতারণা বরকত ধ্বংসের কারণ

[২৯ রবীউল আউয়াল, ১৪৪৮ হি. মোতাবেক ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. হুসাইন ইবনু আব্দুল আযীয আলুশ শায়খ** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন **ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমানতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও যাবতীয় খিয়ানত থেকে নিষেধ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বূদ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে নবী-রাসূলদের রিসালাতের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং তাঁকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

হে আল্লাহ! আপনি তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি এবং তাঁর মর্যাদা ও মহত্ত্বের অধিকারী ছাহাবীগণের প্রতি অগণিত দরূদ, সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন।

অতঃপর, হে মুসলিমগণ! আপনারা মহান আল্লাহকে ভয় করে চলুন। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে উত্তরণের পথ করে দেন এবং সংকটের পর তার জন্য স্বস্তি এনে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক্ব দিবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না' *(আত-তালাক, ৬৫/২–৩)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন' *(আত-তালাক, ৬৫/৪)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইসলামের অকাট্য মূলনীতিগুলোর অন্যতম হলো মুসলিমদের সকল ক্ষেত্রে কল্যাণকামিতা অবলম্বন করা, সকল আচরণে সত্যবাদিতা বজায় রাখা এবং সকল প্রকার লেনদেনে আমানতদারি রক্ষা করে চলা। এই মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতেই ইসলামী শরীআত যাবতীয় প্রতারণাকে হারাম করেছে। বিশেষত মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া সেসব নিন্দনীয় প্রতারণাকে হারাম করা হয়েছে, যা তাদের খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও যানবাহনের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতি করছে। এসব প্রতারণার ধরন এত বেশি যে, তার সবগুলো এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আর এর ক্ষতি ও দুর্ভোগও এত ব্যাপক যে, তা হিসাব করে শেষ করা সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে এ ধরনের প্রতারণা বড় ধরনের খিয়ানত, গুরুতর অপরাধ এবং পৃথিবীতে ব্যাপক অনাচার সৃষ্টির অন্যতম কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের খিয়ানত করো না। আর খিয়ানত করো না নিজেদের আমানতসমূহের, অথচ তোমরা জানো' *(আল-আনফাল, ৮/২৭)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'আর যমীনে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না' *(আল-আ'রাফ, ৭/৫৬)*।

জীবনের বিভিন্ন ধাপে সংঘটিত নানা রূপ ও ধরনের প্রতারণাগুলো মহাপাপ ও মারাত্মক অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করে

বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’।[২৭]

এভাবে যে কোনো পণ্যে প্রতারণা, ধোঁকা ও কারসাজি করে তার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করাও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার শামিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতএব, তোমরা পরিমাপ ও ওযন পূর্ণ করে দাও এবং মানুষের প্রাপ্য বস্তুতে কোনো কমতি করো না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৮৫)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ আরও বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না’ *(আন-নিসা, ৪/২৯)*।

ব্যবসায়িক লেনদেন হোক কিংবা অন্য কোনো ক্ষেত্রে হোক প্রতারণার মাধ্যমে কারও অধিকার হরণ করা মূলত মানুষের প্রাপ্য কমিয়ে দেওয়া এবং এমন যুলম করা, যা পরম সত্যের অধিপতি মহান আল্লাহ কখনোই পছন্দ করেন না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়’ *(আল-মুতাফফিফীন, ৮৩/১)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘আল্লাহ যাকে কোনো জনগণের দায়িত্বশীল করেছেন; অথচ সে নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের কল্যাণ সাধন করেনি, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না’।[২৮]

যার হাতে মুসলিমদের কোনো কল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সে মূলত তাদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন আমানতদার। এ ব্যাপারে জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি যখন কোনো পণ্য বিক্রির জন্য উপস্থাপন করতেন, তখন তার ত্রুটিগুলো ক্রেতার কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতেন। এরপর ক্রেতাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিয়ে বলতেন, আপনি চাইলে এটি গ্রহণ করুন, আর চাইলে ছেড়ে দিন। তখন তাকে বলা হলো, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! আপনি যদি এভাবে করেন, তাহলে তো আপনার কোনো পণ্যই বিক্রি হবে না! তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আমরা মুসলিমদের কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হব।[২৯]

আজকাল নানা ধরনের প্রতারণা শুধু মানুষের অর্থ-সম্পদ আত্মসাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং এ ধরনের প্রতারণার ফলে মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তারা দুরারোগ্য ব্যাধি ও প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এর ফলে মানুষের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। আর যারা এ ধরনের প্রতারণার সঙ্গে জড়িত, তারা একই সঙ্গে একাধিক অপরাধ, নানা ধরনের গুনাহ এবং জঘন্য কর্মকাণ্ডের দায় বহন করে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই তাদের এসব অপকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে অবাক করে এবং সে তার অন্তরে যা রয়েছে, তার উপর আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। আর সে কঠিন ঝগড়াকারী। আর যখন সে ফিরে যায়, তখন যমীনে প্রচেষ্টা চালায় তাতে ফাসাদ করতে এবং শস্য ও প্রাণী ধ্বংস করতে। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না’ *(আল-বাক্বারা, ২/২০৪–২০৫)*। এই আয়াতের মর্মার্থ এ ধরনের প্রতারকদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যথার্থভাবে মিলে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরনের গুনাহ ও অনিষ্ট থেকে হেফাযত করুন- আমীন!

অতএব, হে মুসলিম ভাই! আল্লাহকে ভয় করুন এবং সব ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি থেকে বেঁচে থাকুন। কেননা প্রতারণার পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনেই আপনার জন্য ভয়াবহ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ‘এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের কাছে এমন কোনো পণ্য বিক্রি করা বৈধ নয়, যাতে কোনো ত্রুটি রয়েছে; তবে সে যদি তা ক্রেতাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা’।[৩০]

হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমাদেরকে সব ধরনের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে দূরে রাখুন- আমীন!

হে আল্লাহ! আপনার হালাল দ্বারা আমাদেরকে হারাম থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহে আপনি ব্যতীত অন্য সবার থেকে আমাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।

اللهمَّ صلِّ وسلِّمْ على نبينا محمدٍ.

---

২৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১০১।

২৮. ছহীহ বুখারী, হা/৭১৫০।

২৯. ত্বাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর, হা/২৫১০। এই হাদীছের অন্তর্গত ‘আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আমরা মুসলিমদের কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হব’- অংশটি ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬)।

৩০. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪৬, হাদীছ ছহীহ।

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য—এমন প্রশংসা, যা কখনো নিঃশেষ হবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনিই তাঁর সকল বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি এবং তাওহীদকে সর্বাধিক পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নকারী ছাহাবীগণের প্রতি দরূদ, সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন।

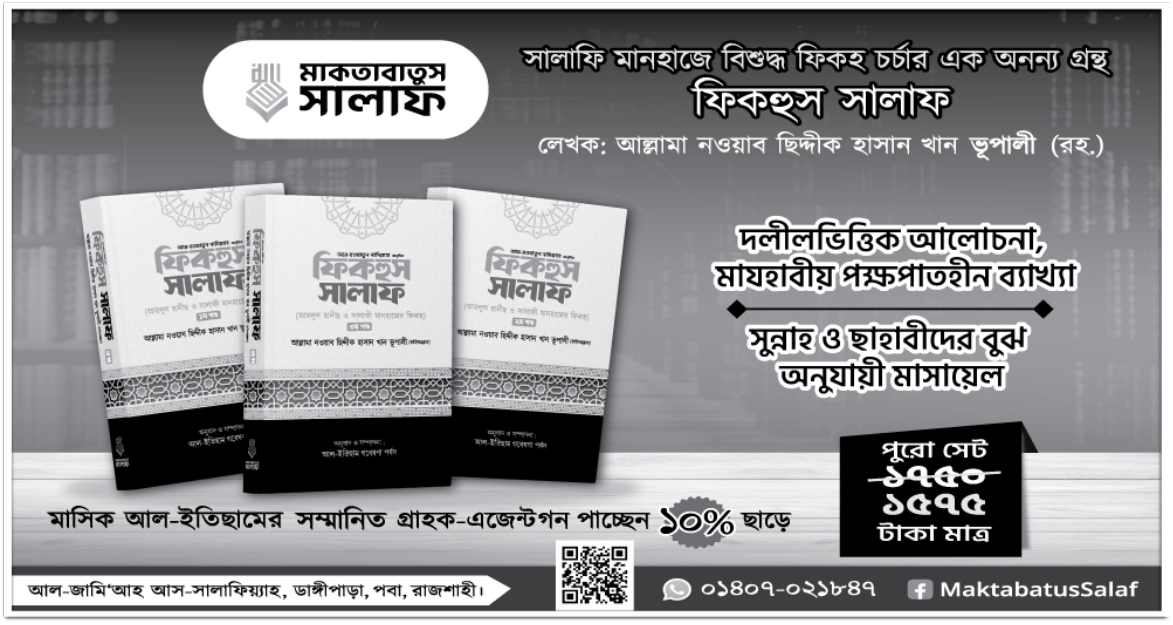
অতঃপর, হে মুসলিমগণ! একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হলো সে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে, আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করে চলবে এবং সব ধরনের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে দূরে থাকবে। আর সে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবে। এর মাধ্যমেই সে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা ও কল্যাণ লাভ করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘ক্রেতা-বিক্রেতা (একে অপরের সাথে) বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং (পণ্যের দোষ-ত্রুটি) যথাযথ বর্ণনা করে, তবে তাদের কেনাবেচায় বরকত হবে; আর যদি তারা মিথ্যা বলে ও (ত্রুটি) গোপন করে, তবে তাদের কেনাবেচার বরকত নষ্ট হয়ে যাবে’।[৩১]

অতএব, হে মুসলিম ভাই! আপনি মহান আল্লাহর ব্যাপারে সত্যবাদী হোন এবং তাঁর সৃষ্টির সঙ্গেও সত্যবাদিতা অবলম্বন করুন। তাহলে তিনি আপনার জন্য প্রত্যেক সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন এবং আপনাকে এমন উৎস থেকে রিযিক্ব দান করবেন, যার কথা আপনি কল্পনাও করতে পারেননি।

হে আল্লাহ! সকল মুসলিম নর ও নারীদের ক্ষমা করুন। আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা কথা ও কাজে সত্যবাদী, আমানত যথাযথভাবে আদায়কারী এবং প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে সদা দূরে থাকে। হে মহামহিম রব! আমাদেরকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং আমাদেরকেও আপনার ফয়সালা ও দানে সন্তুষ্ট রাখুন। হে মহাশক্তিধর প্রতিপালক! আপনি মুসলিমদের ঐক্যকে নেকী ও তাক্বওয়ার উপর সুসংহত করে দিন। তাদেরকে নিজেদের অন্তরের অনিষ্ট এবং তাদের মন্দ কাজের পরিণতি থেকে রক্ষা করুন। তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য। আপনার কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনার সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

৩১. ছহীহ বুখারী, হা/২১১০।



কুরআনের মর্মবাণী

রবের বাণী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-১১)

[সূরা আল-বাক্বারাহ: ৪১-৪২ আয়াত]

﴿وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৪১ আয়াত]

আর এখন সেই কিতাবের উপর ঈমান আনো, যা আমি নাযিল করেছি। এই কুরআন কোনো নতুন বা অচেনা সত্য নিয়ে আসেনি; বরং তাওহীদ, নবুঅত, আখেরাত এবং আল্লাহর আনুগত্যের সেই একই দাওয়াতকে সামনে এনেছে, যা মূল আসমানী কিতাবগুলোতে ছিল। কুরআন তোমাদের নিকটে থাকা আসমানী কিতাবগুলোর মিথ্যায়নকারী নয়, বরং সত্যায়নকারী।

তোমাদের কিতাবে যে শেষ নবীর আগমনের সংবাদ ছিল, যে প্রতিশ্রুত হেদায়াতের জন্য তোমরা যুগের পর যুগ অপেক্ষায় ছিলে, তারই বাস্তব রূপ আজ তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তাই এই কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করা তো বহু দূরের কথা, বরং সবার আগে তোমাদেরই এই কিতাব গ্রহণ করা উচিত ছিল।

অতএব, তোমরাই যেন এই সত্যের প্রথম অস্বীকারকারী না হয়ে যাও। এখানে প্রথম হওয়ার অর্থ সংখ্যাগত প্রথম নয়। আরবের মুশরিকদের অনেকেই ইতোমধ্যে কুরআন অস্বীকার করেছিল। কিন্তু যাদের কাছে কিতাব ছিল, নবুঅতের ইতিহাস ছিল, শেষ রাসূলের পরিচয় ছিল—তাদের পক্ষ থেকে এটা অস্বীকার করা ছিল আরও ভয়াবহ। ইবলীস জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অহংকার ও হিংসার কারণে অবাধ্য হয়ে অভিশপ্ত হয়েছে। যাদের কাছে তাওরাত ও বাইবেল এসেছিল, তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিজেদের সন্তানের চেয়েও বেশি চিনত। পরিচিত সত্যকে তারা শুধু গোষ্ঠীগত অহংকারের কারণে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, আর তোমরা আমার আয়াতগুলোকে তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করো না। দুনিয়াবী স্বার্থ শুধু টাকাপয়সা বা ধনসম্পদ নয়; বরং সাময়িক ক্ষমতা, নেতৃত্ব, সামাজিক মর্যাদা, মানুষের প্রশংসা, জনপ্রিয়তা, গোষ্ঠীগত প্রভাব ও অহংকার এগুলোর সবই দুনিয়াবী স্বার্থ। আল্লাহর হেদায়াতের বিনিময়ে মানুষ যা-ই লাভ করুক না কেন, তা শেষ পর্যন্ত অতি সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদও আল্লাহর একটি আয়াতের মূল্য সমপরিমাণ হতে পারে না।

একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় স্বার্থ হওয়া উচিত, আল্লাহর সন্তুষ্টি না হারানো। মানুষের জনপ্রিয়তা হারানোর ভয় নয়, বরং আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে ভয় করতে হবে। মানুষের প্রতিক্রিয়া, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কা বা দুনিয়াবী ক্ষতির হিসাব নয়; বরং সবচেয়ে বেশি চিন্তা হওয়া উচিত আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর হিসাব নিয়ে।

অতএব, তোমরা সকল কিছুর উপরে আমাকে ভয় করো। আমার সীমারেখা অতিক্রম করা থেকে নিজেকে রক্ষা করো। আমার ক্রোধকে ভয় করো এবং এমন কোনো স্বার্থকে হৃদয়ে স্থান দিয়ো না, যা তোমাদেরকে সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দিকে ঠেলে দেয়।

বাকি অংশ ২৪নং পেজে

৩২* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

www.al-itisam.com



খুলুকুল মুসলিম

শাসক ও নিজের সাথে একজন মুসলিমের আচরণ

মূল: সুলতান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-উমরী
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ বিন সাইদুর রহমান*

(১) শাসকগণের সাথে আচরণ

১. আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়া সকল ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ‘হে মুমিনগণ! আল্লাহর আদেশ মান্য করো, রাসূলের আদেশ মান্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার শাসকদেরও’ *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*। রাসূল ﷺ বলেন, وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ‘যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল, আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল’।[৩৪]

২. তাদের সঙ্গে বিরোধ ও মতভেদ সৃষ্টি না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ ‘তোমরা বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে’ *(আল-আনফাল, ৮/৪৬)*।

৩. সেসব গুজব ও অপপ্রচারের ব্যাপারে সাবধান থাকা, যা কিছু মিডিয়া, চ্যানেল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো হয় এবং যা শাসক ও জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি ও ফিতনা সৃষ্টি করে।

৪. তাদের জন্য দু‘আ করা, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘যদি আমার একটি দু‘আ কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা থাকত, তবে আমি তা শাসকের জন্য করতাম’।[৩৫]

৫. কথাবার্তা বা কার্যকলাপের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে উসকানি দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

৬. শাসক কর্তৃক নির্ধারিত আইন ও ব্যবস্থাপনা মান্য করা; কারণ তা মানুষের জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষা করে।

৭. তাদের সম্পর্কে অপবাদ, গালিগালাজ কিংবা গীবতের মতো জিহ্বা সংক্রান্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকা।

(২) নিজের সাথে আচরণ

১. নিজের দ্বীনকে শিরক, বিদআত ও গুনাহ থেকে নিরাপদ রাখার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।

২. হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার মতো রোগ থেকে পরিশুদ্ধ করা।

৩. ফিতনার স্থান থেকে দূরে থাকা, যাতে তুমি তার বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পার।

৪. নিয়মিত নিজের আত্মসমালোচনা করা, যাতে নিজের ভুলত্রুটি শনাক্ত করে সংশোধন করা যায়।

৫. ভালো কাজের জন্য নিজের নাফসের সঙ্গে সংগ্রাম করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ‘আর যারা আমার পথে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে

৩৩* অধ্যয়নরত, কুল্লিয়্যাহ ২য় বর্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৩৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৫।

৩৫. যদিও এই উক্তিটি ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ-এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তবে তা তার থেকে প্রমাণিত নয়। বরং এটি কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ-এর উক্তি (হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৮/৯১)। শাই বাকর আবূ যায়েদ রহিমাহুল্লাহ ও উক্তিটি ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ-এর হওয়ার বিষয়টি নাকচ করেছেন (আত-তা‘সীল, পৃ. ৭৬)। -সম্পাদক।

পরিচালিত করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৬৯)*।

৬. ইবাদতে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ﴾ 'আর তাঁর ইবাদতে ধৈর্য ধারণ করো বা অবিচল থাকো' *(মারইয়াম, ১৯/৬৫)*।

৭. গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে ধৈর্য ধারণ করা। কারণ গুনাহ থেকে বিরত থাকা আল্লাহর শাস্তি সহ্য করার চেয়ে সহজ।

৮. নবী-রাসূল ও নেককার মানুষের জীবনী পাঠ করা, যাতে তাদের অনুসরণ করা যায়।

৯. আল্লাহর কাছে দু'আ করা, যেন তিনি তোমার নাফসকে সংশোধন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(গাফির, ৪০/৬০)*।

১০. এমন বন্ধু নির্বাচন করা, যে আল্লাহকে ভয় করে। কারণ একজন ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের উপরই চলে।

১১. নিজের ভালো কাজ নিয়ে গর্ব না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ 'আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তবে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনও পবিত্র হতে পারত না' *(আন-নূর, ২৪/২১)*।

১২. খারাপ পরিকল্পনা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক থাকা।

১৩. শারঈ ইলম অর্জন করা। কারণ তা তোমাকে নিজেকে সংশোধনের উপায় শেখায়।

১৪. নাফসের কিছু বৈধ বিষয়ে প্রয়োজন আছে, যেন তা ইবাদত ও কঠোর পরিশ্রমে বঞ্চিত না হয়ে যায়।

১৫. ইবাদতে বৈচিত্র্য আনা, যা নাফসের জন্য কল্যাণকর।

১৬. প্রতিটি নাফসেই দুর্বলতা (অলসতা) আসতে পারে; কিন্তু সতর্ক থাকো, যেন তা স্থায়ী না হয়।

১৭. যদি কোনো গুনাহ করে ফেলো, তাহলে দ্রুত ইস্তিগফার, তওবা ও অনুতাপ করো। কারণ হাদীছে এসেছে, النَّدَمُ تَوْبَةٌ 'অনুতাপই হলো তওবা'।[৩৬]

রবের বাণী এর বাকি অংশ

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

[আল-বাক্বারাহ: ৪২ আয়াত]

সত্যকে অস্বীকার করার অনেকগুলো কুটকৌশল রয়েছে। তন্মধ্যে পূর্বের আয়াতে সরাসরি অস্বীকারের কথা বলা হয়েছে। আর এই আয়াতে সত্যকে গোপন করা এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলার কথা বলা হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন, আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ো না। সরাসরি অস্বীকার না করে মিথ্যাকে যদি সত্যের মোড়কে পেশ করা হয়, তাহলে মানুষ দ্রুত সেটিকে বিশ্বাস করে। সত্যের সংমিশ্রণ থাকায় মানুষ পুরো কথাকেই সত্য মনে করে থাকে। বনূ ইসরাঈল এই কাজে খুবই দক্ষ ছিল। তারা তাওরাতের সাথে নিজেদের প্রবৃত্তি ও স্বার্থকে জুড়ে দিয়ে সত্যের চেহারা বিকৃত করে দিত। মানুষের সামনে এমন একটি মিশ্রিত ধর্ম উপস্থাপন করত, যেখানে আল্লাহর কথাও আছে, আবার মানুষের বানানো কথাও আছে। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারত না যে, কোনটি আল্লাহর নির্দেশ আর কোনটি মানুষের সংযোজন।

আর জেনে-বুঝে তোমরা সত্যকে গোপন করো না। যে সত্য তোমাদের কিতাবে স্পষ্ট ছিল, যে সত্যের সাক্ষী হওয়ার দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পিত হয়েছিল, সেটিকে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখো না। বিশেষ করে সেই সব নিদর্শন, যেগুলো শেষ নবীর আগমনের দিকে ইঙ্গিত করত, সেগুলোকে তারা গোপন করার চেষ্টা করত। অজ্ঞতার কারণে ভুল করা এক জিনিস আর সত্যকে চিনেও তাকে আড়াল করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। জ্ঞান এখানে সম্মান নয়, জ্ঞান এখানে জবাবদিহিতা।

আজকের যুগেও তারা সত্য-মিথ্যা বিকৃত করে। সত্যকে গোপন করে। তারা সারা পৃথিবীতে কম সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে, অথচ তারা নিজেরা সবচেয়ে বেশি সন্তান গ্রহণ করে। সারা পৃথিবীতে তারাই সবচেয়ে বেশি সূদের কারবার করে, কিন্তু নিজেরা কখনো নিজেদের সাথে সূদী লেনদেন করে না।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

৩৬. ইবনে মাজাহ, হা/৪২৫২।

www.al-itisam.com

সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

রুকূর মাঝের সুন্নাতসমূহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

রুকূর মাঝেও বেশ কিছু সুন্নাত রয়েছে, নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো—

১. দুই হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরা এবং হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত রাখা: আবূ হুমাইদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত সম্পর্কে অধিক স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি (ছালাত শুরু করার সময়) তিনি তাকবীর বলে দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন আর যখন রুকূ করতেন, তখন দুই হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন...।[৩৭] আবূ মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, হাঁটুর চারপাশে আঙুলগুলো ছড়িয়ে রাখতেন...।[৩৮]

২. রুকূতে পিঠ সমানভাবে প্রসারিত করা সুন্নাত: আবূ হুমাইদ সাঈদী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ করতেন, তখন দুই হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন...।[৩৯]

অনুরূপভাবে মাথা উঁচুনিচু না রেখে সোজা পিঠ বরাবর সমান রাখা সুন্নাত: ছহীহ মুসলিমে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রুকূর ধরন বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, যখন তিনি রুকূ করতেন, তখন তিনি মাথা উঁচুও রাখতেন না, আবার নিচুও রাখতেন না। বরং মাঝামাঝি রাখতেন।[৪০]

৩. রুকূ অবস্থায় হাতের কনুই পার্শ্বদেশ থেকে আলাদা রাখা সুন্নাত: অর্থাৎ দুই হাত পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখবে। পূর্বের আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাদীছ। তাতে রয়েছে, তিনি (ইবনু মাসঊদ) রুকূ করলেন, অতঃপর তার দুই হাত পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখলেন, তারপর দুই হাত হাঁটুর উপর রাখলেন আর হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত রাখলেন... এরপর তিনি বললেন, আমি এভাবেই রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ছালাত আদায় করতে দেখেছি।[৪১]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দুই হাত পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে কোনো আলেম দ্বিমত করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ এব্যাপারে আলেমদের অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, রুকূ ও সিজদাতে দুই হাত পার্শ্বদেশ থেকে দূরে রাখা মুস্তাহাব।[৪২]

৪. রুকূতে রুকূর জন্য বর্ণিত দু'আ পাঠ করা সুন্নাত:

রুকূতে 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' পাঠসহ অন্যান্য দু'আ পাঠ করা সুন্নাত। দু'আসমূহ নিম্নরূপ-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

(ক) 'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমি প্রশংসা সহকারে তোমার পবত্রিতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো'। এ দু'আটি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[৪৩]

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

(খ) '(আল্লাহ) স্বীয় সত্তায় পবিত্র এবং গুণাবলিতেও পবিত্র, যিনি ফেরশতাকুল এবং জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর প্রতিপালক'। এ দু'আটি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[৪৪]

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي

(গ) 'হে আল্লাহ! তোমার জন্যই রুকূ করেছি, একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি। একমাত্র তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। আমার কর্ণ, চোখ, মস্তিষ্ক, হাড়, স্নায়ু তোমার ভয়ে-শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত'। এ দু'আটি আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[৪৫]

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

(ঘ) 'ক্ষমা, রাজত্ব, বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী যিনি, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি'।[৪৬]

---

৩৭. ছহীহ বুখারী, হা/৮২৮।

৩৮. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭০৮১; আবূ দাউদ, হা/৮৬৩; নাসাঈ, হা/১০৩৮, হাদীছটির সনদ হাসান। ইবনু খুযায়মাতে বর্ণিত ওয়ায়েল ইবনু হুজর এর হাদীছটি তার শাহেদ হাদীছ।

৩৯. ছহীহ বুখারী, হা/৮২৮।

৪০. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯৮।

৪১. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭০৮১; আবূ দাউদ, হা/ ৮৬৩; নাসাঈ, হা/১০৩৮, হাদীছটির সনদ হাসান। ইবনু খুযায়মাতে বর্ণিত ওয়ায়েল ইবনু হুজর এর হাদীছটি তার শাহেদ হাদীছ।

৪২. আল-মাজমূ', ৩/৪১০।

৪৩. ছহীহ বুখারী, হা/৭৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮৪।

৪৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮৭।

৪৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৭১১।

৪৬. আহমাদ, হা/২৩৪১১; আবূ দাউদ, হা/৮৭৩; নাসাঈ, হা/১০৫০। আলোচ্য দু'আটি আউফ ইবনু মালেকের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, আবূ দাউদ, ৪/২৭।

www.al-itisam.com

সাময়িক প্রসঙ্গ

হতাশাই শেষ কথা নয়: আত্মহত্যার বিরুদ্ধে ইসলামের বার্তা

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

মানুষের জীবন আল্লাহ তাআলার দেওয়া এক অমূল্য নিয়ামত। জীবনের নানা সংকট ও হতাশা কখনো মানুষকে নিজের জীবনকেই অসহনীয় মনে করাতে পারে। অথচ একজন মুমিনের জন্য কোনো সংকটই চূড়ান্ত নয়। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

ইসলামে আত্মহত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। একই সঙ্গে হতাশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তাকে আশার পথে ফিরিয়ে আনা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ৭ লাখ মানুষ আত্মহত্যার মাধ্যমে প্রাণ হারায়। বাংলাদেশেও আত্মহত্যা একটি ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা। এই প্রবন্ধে কুরআন ও হাদীছের আলোকে আত্মহত্যার নিষেধাজ্ঞা, হতাশা থেকে উত্তরণের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইসলামে জীবনের মর্যাদা ও আত্মহত্যার কঠোর নিষেধাজ্ঞা:

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের জীবন আল্লাহর দেওয়া সবচেয়ে মূল্যবান উপহার ও আমানত। আর এই আমানতের যত্ন নেওয়া এবং এর শুকরিয়া আদায় করা আমাদের সবার ঈমানী দায়িত্ব। পৃথিবীর কোনো মানুষই তার জীবন নিজে সৃষ্টি করেনি, তাই একে হত্যা করার কোনো অধিকারও মানুষের নেই। এই জীবন আল্লাহর দেওয়া একটি পরীক্ষা, যার প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের কর্মের হিসাব নেওয়া হবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু’ *(আন-নিসা, ৪/২৯)*। এই আয়াতটি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেয় যে, নিজের জীবন শেষ করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আর তাই ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা একটি মহাপাপ।

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ এই বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরদিন সে জাহান্নামের মধ্যে অনুরূপভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে’।[৪৮] অর্থাৎ আত্মহত্যা শুধু একটি ভুল বা পাপ নয়; বরং এমন একটি কাজ, যার পরিণতি পরকাল পর্যন্ত বয়ে বেড়াতে হবে। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

আত্মহত্যার সাধারণ কারণ এবং ইসলামের সমাধান:

আমাদের সমাজে আত্মহত্যার পেছনে বিভিন্ন সামাজিক, মানসিক ও পারিবারিক কারণ কাজ করে। এসব সমস্যার সমাধানে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। তাই আত্মহত্যার কারণসমূহ এবং সেগুলোর ইসলামী সমাধান সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরী।

মানসিক চাপ ও একাকিত্ব: অনেক মানুষ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট ও হতাশার কথা অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে না পেরে ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ে। একসময় তারা নিজেকে একা ও অসহায় মনে করতে শুরু করে। ইসলাম এ ধরনের পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ এবং ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের মাধ্যমে একজন মুসলিম তার দুঃখ, কষ্ট, হতাশা ও দুশ্চিন্তার কথা আল্লাহর কাছে তুলে ধরতে পারে। এর ফলে অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরশীলতা দৃঢ় হয়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো’। এছাড়া নিয়মিত জামাআতে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে একজন মানুষ নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে না; বরং অন্যের সহানুভূতি, সমর্থন ও সঙ্গ লাভ করে। এভাবেই ইসলাম মানুষের একাকিত্ব দূর করে এবং তাকে আশা, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসের পথে পরিচালিত করে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট: বেকারত্ব, ঋণের বোঝা, সম্পর্কের অবনতি বা বিচ্ছেদ, পারিবারিক অশান্তি এবং সামাজিক অপমান—এসব কারণে মানুষের জীবনে গভীর হতাশা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হতে পারে। অনেক সময় এসব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মানুষ আশাহীন হয়ে পড়ে এবং জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শয়তান মানুষের এই দুর্বল মুহূর্তগুলোর সুযোগ নিয়ে তাকে হতাশা ও ভ্রান্ত চিন্তার দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে।

ইসলাম এ ধরনের পরিস্থিতিতে ছবর (ধৈর্য) ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা)-এর শিক্ষা দেয়। একজন মুমিন বিশ্বাস

৪৭* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

৪৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৭৮।

www.al-itisam.com

করে যে, জীবনের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এবং প্রতিটি কষ্টের সঙ্গেই আল্লাহ সহজতার ব্যবস্থা করে রাখেন। তাই সংকটের সময় হতাশ না হয়ে ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশায় তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা একজন মুসলিমের কর্তব্য।

যারা আন্তরিকভাবে নিজেদের ঈমান ও আমলকে পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, আল্লাহ তাদের জন্য উত্তরণের পথ সহজ করে দেন। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে সাদাসিধে ও সংযমী জীবনযাপন করলে অপ্রয়োজনীয় সামাজিক প্রতিযোগিতা, ভোগবিলাসের চাপ এবং মানুষের অযৌক্তিক প্রত্যাশা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। এর ফলে মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং জীবনের সংকট মোকাবিলা করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে ওঠে।

শারীরিক অসুস্থতা ও দীর্ঘমেয়াদী কষ্ট: প্যারালাইজড, ক্যানসার, কিডনি ডায়ালাইসিস, বাত-ব্যথা বা অক্ষমতা—এই ধরনের দীর্ঘস্থায়ী রোগ অনেককে মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলে। কিন্তু ইসলাম শেখায় এই সব কষ্ট সাময়িক এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের পরীক্ষা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, অনিষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ থেকে ক্ষমা করেন’।[৪৯] এটি আমাদের শেখায়, জীবনের কষ্টগুলো আসলে পাপ মোচনের একটি উপায়।

হতাশাই শেষ কথা নয়: ইসলামের আশার বাণী

ইসলামের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো আল্লাহর রহমত ও আশার আলো। আল্লাহ তাআলার রহমত অসীম। তিনি মানুষকে কখনো হতাশ হতে শেখান না। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ ‘বলুন! হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করেন’ *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩)*। এই আয়াতটি প্রত্যেক হতাশাগ্রস্ত মানুষের জন্য আশা ও শান্তির বার্তা। কষ্ট যত বড়ই হোক, আল্লাহর রহমত তার চেয়ে বড়। তিনি আমাদের প্রতিটি বিপদ ও দুঃখের পর স্বস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইসলামে ছবর (ধৈর্য) মানে হলো কষ্টের সময় নিজের ঈমানকে দৃঢ় রাখা। আর তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) মানে হলো নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করার পর ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেন, ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ‘অতঃপর নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে’ *(আল-ইনশিরাহ, ৯৪/৫-৬)*। অর্থাৎ যেকোনো কষ্টের সাথে আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন। কোনো মুমিন যদি কষ্ট সহ্য করতে পারে, তবে তার জন্য অবশ্যই পুরস্কার রয়েছে। দু‘আ, ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াত মানুষের মনের ভেতর দারুণ শান্তি আনে। আল্লাহ বলেন, ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণে অন্তর শান্তি পায়’ *(আর-রা‘দ, ১৩/২৮)*। এই আয়াতটি হতাশ হৃদয়ের জন্য এক আলোর প্রদীপ, যা আমাদের বলে, মন যতই ভারী হোক, আল্লাহর দিকে ফিরে গেলে শান্তি আসবেই। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ‘যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট’ *(আত-ত্বালাক, ৬৫/৩)*।

সুতরাং যেকোনো দুঃখ-দুর্দশা বা কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর বান্দা যদি তাকে ডাকে, আল্লাহ অবশ্যই তার কষ্ট দূর করে দিবেন এবং এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। অতএব, দুঃখ-দুর্দশায় আমরা কখনো ভেঙে পড়ব না। সবসময় হাসি-খুশিতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব এবং বলব, ‘আল-হামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল’ (সকল অবস্থায় আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা)। এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের অবশ্যই সঠিক পথ এবং উত্তম প্রতিদান দিবেন।

মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামী দায়িত্ব:

ইসলাম শুধু নিজের জীবন বাঁচানোর কথা বলে না, বরং অন্যের জীবন বাঁচানোর জন্যও উৎসাহিত করে। বিপদে থাকা কোনো মুসলিম ভাই বা বোনের পাশে দাঁড়ানো, তার খোঁজ নেওয়া, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনা, তাকে উৎসাহ দেওয়া—এসব কাজ ইসলামে অনেক ছওয়াব ও বড় ফযীলতের বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন’।[৫০]

তাই হতাশাগ্রস্ত কারো পাশে দাঁড়ানো শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়, বরং একটি ইবাদত। যখন কোনো মুমিন অন্য মুমিনের জন্য দু‘আ করে, তখন আল্লাহ সেই মুমিনকেও তার দু‘আর ফযীলত দান করেন। একজন ভালো শ্রোতা হয়ে তার কথা শোনা, তাকে বোঝা এবং তার পাশে থাকা, এসব ছোট কাজই একজন আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে বাস্তব পদক্ষেপ:

আত্মহত্যা প্রতিরোধে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়, সব পর্যায়েই কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। এই পদক্ষেপগুলো সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

প্রিয়জনের আচরণের পরিবর্তন চেনা: আত্মহত্যাপ্রবণতা প্রায়শই কিছু সতর্ক সংকেত দেখিয়ে দেয়। যেমন- হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যাওয়া, হতাশাগ্রস্ত দেখানো, জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা অথবা বিদায়সূচক কথা বলা ইত্যাদি। এই

৪৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪১।

৫০. ছহীহ বুখারী, হা/২২৮০।

www.al-itisam.com

সংকেতগুলো উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাকে নিয়ে দ্রুত কথা বলতে হবে, তবে কোনো রকম বিচার বা সমালোচনা না করে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে হবে।

পেশাদার বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিশ্চিত করা: মানসিক কষ্ট, বিষণ্নতা বা অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা কোনো লজ্জার বিষয় নয়; এগুলো শারীরিক অসুস্থতার মতোই বাস্তব এবং গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে। তাই এ ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে যথাসময়ে পেশাদার বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা অত্যন্ত জরুরী।

প্রয়োজনে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী (সাইকোলজিস্ট) বা কাউন্সেলরের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। পরিবার, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উচিত আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করা, তাকে মানসিক সমর্থন দেওয়া এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা, পরামর্শ এবং পারিবারিক সহযোগিতা একজন মানুষকে হতাশা কাটিয়ে উঠতে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ উন্নত করা: পরিবারে এমন একটি উষ্ণ, নিরাপদ ও খোলামেলা পরিবেশ তৈরি করা দরকার, যেখানে যে কেউ নিজের সমস্যার কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারে। সামাজিকভাবে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যে ভুল ধারণা ও কুসংস্কার রয়েছে, তা ভাঙতে হবে।

২৪/৭ হেল্পলাইন প্রচার করা: হতাশার চরম মুহূর্তে একটি ফোনকলই একটি জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে। তাই ২৪/৭ মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা হেল্পলাইনগুলোর প্রচার অত্যন্ত জরুরী। Kaan Pete Roi (০১৭৭৯-৫৭২-৮৭১), Moner Bondhu (০১৭৭৯-৮৮৪-৫১৫), PHWC (০১৭৭৯-০০৮-০৮৮)-এর মতো নম্বরগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সমর্থন: ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সমর্থন অত্যন্ত কার্যকর একটি মাধ্যম। মসজিদ, মাদরাসা ও ইসলামী সেন্টারে ইমাম ও আলেমরা যদি নিয়মিতভাবে খুৎবা, দারস বা আলোচনার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য ও এর ইসলামী সমাধান নিয়ে কথা বলেন, তাহলে তা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। এটি মানুষকে মনে করিয়ে দেবে যে, জীবন আল্লাহর দেওয়া একটি অমূল্য আমানত।

ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ: যাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা আছে, তাদের নাগালের বাইরে বিষাক্ত রাসায়নিক, অতিরিক্ত ওষুধ, ধারালো অস্ত্র বা আত্মহত্যায় ব্যবহৃত হতে পারে এমন বিপজ্জনক উপকরণ সুরক্ষিত রাখতে হবে। তাদেরকে একা রাখা যাবে না।

গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা: গণমাধ্যমের এই বিষয়ে অত্যন্ত দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত। আত্মহত্যার খবর এমনভাবে প্রকাশ করা যাবে না, যাতে তা অনুকরণীয় মনে হয়। বরং আত্মহত্যার বদলে জীবনের ইতিবাচক দিক এবং কীভাবে মানুষ হতাশা কাটিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করেছে, এমন অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলো বেশি করে প্রচার করা উচিত।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: স্কুল ও কলেজে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ডাক্তার, ইমাম ও কমিউনিটি লিডারদের আত্মহত্যা প্রতিরোধের প্রাথমিক গাইডলাইন দেওয়া উচিত, যাতে তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে মানুষকে সঠিক সহায়তা দিতে পারেন। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রতিটি জীবনকে সুন্দরভাবে বাঁচতে এবং একটি সুস্থ ও সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

হতাশা নয়, আলোর দিকে ফিরে আসুন: হতাশা জীবনের একটি সাময়িক অংশ, তবে কখনোই শেষ কথা নয়। ইসলাম আমাদের হতাশ হতে শেখায় না, বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করে তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়।

যখন একজন মানুষ মনে করে তার সব শেষ, তার জীবনের আর কোনো অর্থ নেই, তখনও আল্লাহ তাকে ছেড়ে দেন না। কোনো প্রাণ যতই বিপর্যস্ত হোক, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে প্রতিনিয়ত ডাকা হয়, 'ফিরে এসো, আমার দরজা এখনও খোলা'। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ 'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩)*। এই বাণী যেন প্রত্যেক ভেঙে পড়া হৃদয়ের জন্য একটি বিশেষ দাওয়াত।

কারও কান্না যদি সত্য হয়, আল্লাহ সেই কান্নার শব্দ শোনেন। পাপ যদি অনেক হয়, আল্লাহর ক্ষমা সেই পাপের চাইতে বড়। তিনি বলেছেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু' *(আল-বাকারা, ২/১৭৩)*।

উপসংহার:

সুতরাং আত্মহত্যার মতো চরম সিদ্ধান্ত কোনো সমাধান নয়, বরং আল্লাহর রহমতের প্রতি গভীর আস্থাই জীবনের নতুন শুরুর পথ। হতাশা ক্ষণস্থায়ী হলেও, আল্লাহর দয়া চিরস্থায়ী ও অসীম। হয়তো আল্লাহই আপনার জন্য পরবর্তী দিনে জীবনে নতুন শান্তির দ্বার খুলে রেখেছেন। আল্লাহর দরবারে মাথা নত করলে ভেঙে যাওয়া হৃদয়ও আবার গড়ে ওঠে। কারণ জীবন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত।

আসুন, আমরা সবাই মিলে আত্মহত্যা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করি, মানসিক কষ্টে থাকা মানুষদের পাশে দাঁড়াই, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সমর্থন প্রদান করি। পাশাপাশি একে অপরকে এই বার্তাটি স্মরণ করিয়ে দিই যে, হতাশাই শেষ কথা নয়; বরং আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের দরজা সবসময় খোলা। তাঁর কাছে প্রতিটি কঠিন অবস্থার পরই রয়েছে একটি নতুন আশা, একটি নতুন সম্ভাবনা এবং একটি নতুন সূচনা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!



তারবিয়াতুল আওলাদ



সন্তান কি আপনার অপূর্ণ স্বপ্নের বাহক?

-জাহিদ হাসান*

বিকেলের সোনাঝরা রোদটা ড্রয়িংরুমের কাচের জানালা গলে টেবিলের ওপর এসে পড়েছে। টেবিলে একটা ঝকঝকে মেডেল আর কাচবাঁধানো ফ্রেম—'আব্দুর রহমান, মেধা তালিকায় প্রথম, বিজ্ঞান শাখা'।

বাসায় মেহমান এসেছেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আব্দুর রহমানের বাবা গলায় রাজ্যের আত্মতৃপ্তি আর গর্বের সুর ঢেলে বলছেন, জানেন ভাই, আমার এই ছেলেটাকে নিয়ে আমার অনেক বড় স্বপ্ন। ও মেডিকেলে পড়বে, নামকরা ডাক্তার হবে ইনশা-আল্লাহ! আমি ছোটবেলায় অর্থের অভাবে ডাক্তার হতে পারিনি, ইন্টারের পরেই পড়াশোনা থেমে গিয়েছিল। কিন্তু আমার ছেলেকে আমি সেই অভাব বুঝতে দেইনি। আমার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন ও-ই পূরণ করবে।

মেহমানরা প্রশংসার হাসি হাসলেন। মাথা নাড়িয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনার মনের আশা পূরণ করবেন ভাই, ইনশা-আল্লাহ!

কিন্তু ঘরের অন্য প্রান্তের দৃশ্যটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা সতেরো বছরের ছেলেটার মুখের কোণে কোনো হাসির রেখা নেই। তার বুকের ভেতরটা যেন নিমিষেই ভারী হয়ে এলো। তার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে ড্রয়িং খাতায় লুকিয়ে রাখা আছে চমৎকার সব গাড়ির নকশা, অ্যারোডাইনামিকসের স্কেচ আর ইঞ্জিনের জটিল মেকানিজম। আব্দুর রহমানের ধমনিতে রক্ত নয়, যেন মেকানিক্স আর ক্রিয়েটিভিটির অদ্ভুত এক নেশা ছোটাছুটি করে। সে ঘণ্টায় পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিতে পারে মেকানিক্সের জটিল সমীকরণ মিলিয়ে।

কিন্তু আফসোস! বাবার সাজানো স্বপ্নের মানচিত্রে আব্দুর রহমানের এই সহজাত ভালোবাসার বিন্দুমাত্র ঠাঁই নেই। কারণ এই স্বপ্নে বাবা তাকে একজন 'মানুষ' বা একজন 'স্বতন্ত্র সত্তা' হিসেবে দেখছেন না; দেখছেন নিজের অতীত ব্যর্থতার কাফন মুড়িয়ে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলার একটা জ্যান্ত মাধ্যম হিসেবে!

এই দৃশ্যটি কি খুব অপরিচিত? একদম নয়। আমাদের আশপাশের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোর দিকে তাকালে আমরা এমন হাজারো গল্প দেখতে পাব। ভালোবাসার দোহাই দিয়ে, তথাকথিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোড়কে মুড়িয়ে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের সন্তানদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি আমাদের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বিশাল এক এক পাহাড়।

প্রশ্ন হলো, এটা কি আসলেই তারবিয়াত (সঠিক লালনপালন)? নাকি সন্তানকে নিজের মানসিক অহং পূরণের ট্রফি বানানোর এক সূক্ষ্ম সামাজিক ব্যাধি?

দেখুন, সমস্যাটা কিন্তু ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া নিয়ে নয়। চিকিৎসক কিংবা প্রকৌশলী প্রতিটিই অত্যন্ত সম্মানজনক পেশা এবং দ্বীন ও উম্মাহর খেদমতের একেকটি মহৎ মাধ্যম।

আসল গলদটা তৈরি হয় ঠিক তখনই, যখন আমরা সমাজের নির্দিষ্ট দু-একটা পেশাকে সাফল্যের একমাত্র শেষ সীমা বানিয়ে বসি। আর সেই মনগড়া ছাঁচে ফেলার জন্য সন্তানের ফিতরাত বা আল্লাহপ্রদত্ত সহজাত প্রতিভাকে পিষে ছাতু করে দিই।

একটু ভেবে দেখুন তো, যখন আমরা আমাদের সন্তানকে বলি, 'পাশের বাসার অমুকের ছেলে তো মেডিকেলে চান্স পেয়ে গেল, তুই কেন পারলি না?' বা 'তুই যদি অমুক জায়গায় চান্স না পাস, তবে সমাজে আমাদের আর মুখ দেখানোর কোনো জায়গা থাকবে না!'

তখন কি আমরা বুঝতে পারি, কী ভয়ংকর এক অদৃশ্য ডাইনামাইট আমরা ফিট করে দিচ্ছি সেই কাঁচা, স্পর্শকাতর মনটার ভেতরে?

মনোবিজ্ঞানের কঠিন পরিভাষায় একে বলা হয় Conditional Self-Worth বা শর্তসাপেক্ষ আত্মমূল্যবোধ। তবে সাধারণ সহজ চোখে এর নাম দেওয়া যায়, ভালোবাসার বদলে শর্ত চাপানো।

এমন বাক্যগুলো প্রতিনিয়ত বাবা-মায়ের মুখে শোনার পর শিশু বা কিশোর সন্তানটি অবচেতনভাবেই ধরে নেয়, বাবা-মা

৫১* শিক্ষক, লেখক, কিডস অ্যান্ড প্যারেন্টিং অ্যাক্টিভিস্ট।

আমাকে ভালোবাসেন আমি 'আমি' বলে নয়; বরং আমি তাদের মেকি স্বপ্ন আর সোশ্যাল স্ট্যাটাসের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি বলেই ভালোবাসেন। আমি যদি কখনো ফেল করি বা তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারি, তবে তাদের কাছে আমার এই রক্ত-মাংসের জ্যান্ত অস্তিত্বের কোনো মূল্যই আর অবশিষ্ট থাকবে না। আমি আসলে তাদের অযোগ্য এক সন্তান!

চিন্তা করুন তো, কতটা ভয়াবহ এই অনুভূতি! একটি সন্তান যখন তার নিজের ঘরেই নিঃশর্ত ভালোবাসা পায় না, তখন তার ভেতরের আলোটা তিল তিল করে নিভে যেতে থাকে। এই বিষাক্ত ধারণা নিয়ে যে সন্তান বড় হয়, সে সারা জীবন এক অদৃশ্য, ক্লান্তিকর ইঁদুরদৌড়ে (Rat Race) দৌড়াতে থাকে।

সে যা-ই করুক না কেন, পড়াশোনা, চাকরি কিংবা ক্যারিয়ার, কোনোটিতেই সে প্রকৃত আত্মিক আনন্দ খুঁজে পায় না। সে কেবল ছুটে চলে অন্যের অনুমোদন (Validation) পাওয়ার পেছনে, সমাজের কৃত্রিম করতালির আশায়।

ফলাফল? একসময় ঘরের এক কোণে কিংবা বন্ধ ঘরের অন্ধকারে গড়ে ওঠে বিষণ্নতার পাহাড়, ভর করে দীর্ঘমেয়াদি উদ্বেগ (Anxiety), আর তৈরি হয় চরম এক আত্মপরিচয়ের সংকট। সে আয়নায় তাকায় ঠিকই, কিন্তু আয়নার ওপারে নিজের আসল সত্তাকে আর খুঁজে পায় না।

আসুন, অন্ধ সামাজিক কুসংস্কার আর লৌকিকতার ধুলোবালি সরিয়ে এবার একটু অহীর আলোর দিকে তাকাই। দেখার চেষ্টা করি, আমাদের এই চরম সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির বিপরীতে ইসলাম আমাদের কী মহৎ শিক্ষা দেয়?

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে, যখন আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জন্মই হয়নি, তখন আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা আমল করে যাও (নিজের নিজ নিজ কাজ অব্যাহত রাখো)। কারণ প্রতিটি মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই পথটি সহজ করে দেওয়া হয়েছে'।[৫২]

কী প্রজ্ঞাপূর্ণ এক বাণী! আসমানের মালিক কোনো মানুষকে উদ্দেশ্যহীনভাবে বা আরেকজনের কার্বন কপি (Carbon Copy) বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠাননি।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কত অদ্ভুত এক পরম মমতায় এই রহস্যের পর্দা উন্মোচন করেছেন দেখুন, আল্লাহ বলেন,﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾ 'বলুন, প্রত্যেকেই তার নিজস্ব শাকিলাহ (স্বভাব, প্রকৃতি বা অভ্যন্তরীণ গঠন) অনুযায়ী কাজ করে। সুতরাং আপনার রব সবচেয়ে ভালো জানেন, কে অধিক সঠিক পথে রয়েছে' (আল-ইসরা, ১৭/৮৪)।

মুফাসসিরীনে কেরাম এই আয়াতে ব্যবহৃত 'শাকিলাহ' (شَاكِلَة) শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, শাকিলাহ হলো নিয়্যত, দ্বীন, ত্বরীক্বা, অভ্যাস, স্বভাব, প্রকৃতি ইত্যাদি। অর্থাৎ সহজ করে বললে, শাকিলাহ একজন মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক ছাঁচ, তার সহজাত মেধা, ভেতরের সুপ্ত ঝোঁক আর মানসিক বৈশিষ্ট্য।

ভেবে দেখুন, সৃষ্টিজাহানের মালিক নিজে প্রতিটা মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে তৈরি করেছেন। কারও মাথায় দিয়েছেন গণিতের জটিল হিসাব মেলানোর প্রজ্ঞা, কারও হাতে দিয়েছেন ক্যালিগ্রাফির অসাধারণ কারুকাজ, কাউকে বানিয়েছেন শব্দের রাজপুত্র আর কাউকে দিয়েছেন নেতৃত্ব বা গবেষণার প্রখর তেজ।

এই ভিন্নতা কোনো অপূর্ণতা নয়, কোনো বিচ্যুতি নয়; বরং এটা রাজাধিরাজ আল্লাহর রহমতের এক অপূর্ব শিল্পকলা! অথচ আমরা অভিভাবকেরা কত বড় দুঃসাহস দেখাই, যখন আল্লাহর নিজ হাতে গড়া এই বৈচিত্র্যময় ফিতরাতকে অস্বীকার করে সবাইকে জোর করে একটিমাত্র ছাঁচে পিষে ফেলার চেষ্টা করি!

আজকের যুগের কোনো নামিদামি কোচিং সেন্টার কিংবা প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের মতো আল্লাহর রাসূল ﷺ কিন্তু তাঁর ছাহাবীদের কোনো কৃত্রিম ছাঁচে ঢালার চেষ্টা করেননি। তিনি কখনো বলেননি যে, সবাইকে কেবল তরবারি হাতে ময়দানের সেনাপতিই হতে হবে কিংবা সবাইকে দিনরাত মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবাই দিতে হবে। বরং তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ! প্রতিটি ছাহাবীর ভেতর লুকিয়ে থাকা সুপ্ত রত্নটিকে তিনি নিখুঁতভাবে চিনে নিয়েছিলেন এবং সেই অনুসারেই তাদের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়েছিলেন।

সুনানে তিরমিযীর একটি প্রসিদ্ধ হাদীছে নবী ﷺ ছাহাবীদের বিশেষায়িত যোগ্যতার এমন এক অপূর্ব ক্যানভাস এঁকেছেন, যা আধুনিককালের নামিদামি ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংকেও বহু পেছনে ফেলে দেয়।

» আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু দয়া, মমতা ও অনুকম্পায় এই উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠতম।
» উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু আল্লাহর দ্বীনের সত্য ও ন্যায়বিচারে আপসহীন ও দৃঢ়তায় অতুলনীয়।
» উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু অধিক উত্তমরূপে কুরআন মাজীদ পাঠকারী।
» মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু হালাল ও হারামের সূক্ষ্মতম জ্ঞানে সবচেয়ে পারদর্শী।
» যায়েদ ইবনু ছাবিত রাযিয়াল্লা-হু আনহু ফারায়েয (উত্তরাধিকার আইন) ও ভাষাবিজ্ঞানে অনন্য বিশেষজ্ঞ।

এবার আরেকটু চিন্তা করুন তো! খালিদ ইবনু ওয়ালীদ

৫২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৭।

রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ধমনিতে রক্ত নয়, যেন জ্বলছিল রণকৌশল ও নেতৃত্বের প্রখর তেজ। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ তাঁর সেই সাহসিকতাকে চিনতে পেরে তার হাতেই তুলে দিলেন বীর সেনাপতির গৌরবময় বাটন।

অন্যদিকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দৈহিক গড়ন ছিল অত্যন্ত রোগা ও ক্ষীণকায়, কিন্তু তার অন্তরে খেলা করছিল কুরআনের গভীর প্রজ্ঞা ও ইলমের প্রখর তীক্ষ্ণতা। নবী ﷺ তাকে রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগে সেনাপতি বানিয়ে পাঠাননি; বরং উম্মতের ইলম ও কুরআন শিক্ষার মহান শিক্ষক হিসেবে আসমানের আলো ছড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন!

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি ছাহাবীকে তার নিজস্ব শক্তির জায়গায়, তার নিজস্ব ফিতরাতের মানচিত্রে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন।

হাদীছের পাতায় কত চমৎকার একটি ঘটনা এসেছে দেখুন, একবার এক যুবক আবেগভরে এসে আবেদন জানালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সরাসরি যুদ্ধে যেতে বলেননি। তিনি উল্টো জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাবা-মা কি জীবিত আছেন?' যুবক উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তারা জীবিত আছেন। নবী ﷺ তখন বললেন, 'তাহলে তাদের খেদমত ও যত্নের ভেতরেই তুমি তোমার জিহাদ পরিচালনা করো'।[৫৩]

ভেবে দেখুন, এই একটি ঘটনা থেকে আমরা কী গভীর শিক্ষা পাই?

প্রত্যেক মানুষের জন্য একটাই ধরাবাঁধা পথ নয়। পথ নির্ধারিত হয় ব্যক্তির পরিস্থিতি, তার সামর্থ্য এবং আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরাত বিচার করে। আজকের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক আমাদের প্রিয় নবী ﷺ যদি প্রতিটি মানুষের ফিতরাত, মানসিক ঝোঁক আর বৈচিত্র্যময় প্রতিভাকে এভাবে পরম মমতায় সম্মান জানাতে পারেন; তবে আমরা কোন সাহসে, কোন যুক্তিতে আমাদের সন্তানদের নিজেদের জোড়াতালি দেওয়া সংকীর্ণ ছাঁচে পিষে মারার দুঃসাহস দেখাই?

তাছাড়া কুরআনুল কারীমে পিতা ও সন্তানের সম্পর্কের সবচেয়ে মহিমান্বিত, আবেগপূর্ণ এবং নিখুঁত যে দৃশ্যপট আল্লাহ তাআলা ফুটিয়ে তুলেছেন, তা হলো লুক্বমান আলাইহিস সালাম এবং তার সন্তানের সেই অমর কথোপকথন।

সূরা লুক্বমানে আমরা দেখতে পাই, এক দূরদর্শী প্রজ্ঞাবান পিতা তার সন্তানকে পরম ভালোবাসায় জীবনের চরম সত্যগুলো শেখাচ্ছেন। কিন্তু সেই দীর্ঘ নছীহতে লুক্বমান আলাইহিস সালাম কি তার ছেলেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমাকে অমুক রাজপ্রাসাদের মন্ত্রী হতে হবে কিংবা তোমাকে অমুক ধনকুবের সওদাগর হতেই হবে?

একদম না! তিনি সন্তানের কাঁধে পেশা বা সামাজিক মর্যাদার কোনো বাহ্যিক তকমা চাপিয়ে দেননি; বরং তিনি পরম মমতায় হাত দিয়েছিলেন জীবনের মূল বুনিয়াদে।

তিনি সর্বপ্রথমে তার সন্তানের হৃদয়ে এঁকে দিয়েছিলেন আক্বীদা ও তাওহীদের অবিচল চেতনা, 'হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না; নিশ্চয়ই শিরক মস্ত বড় যুলম'।

এরপর তিনি সন্তানকে গড়ে তুলেছেন ইবাদত ও নিখুঁত আখলাকের উপর। তিনি শিখিয়েছেন কীভাবে একনিষ্ঠভাবে ছালাত ক্বায়েম করতে হয়, কীভাবে মানুষকে দ্বীনের পথে ডাকতে হয়, অসৎকাজ থেকে বারণ করতে হয় এবং জীবনের কঠিনতম ঝড়ে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

এমনকি সামাজিকভাবে একজন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আচরণ কেমন হওয়া উচিত, তা-ও তিনি ভুলে যাননি। অত্যন্ত অভিভাবকসুলভ দরদ নিয়ে শিখিয়েছেন কখনো যেন অহংকারভরে মাটিতে পা না ফেলে, মানুষের সঙ্গে অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে কথা না বলে এবং কথা বলার সময় নিজের কণ্ঠস্বরকে সংযত, নিচু ও কোমল রাখে।

এটাই হলো প্রকৃত ইসলামিক প্যারেন্টিং-এর চিরন্তন স্পিরিট! একজন অভিভাবক হিসেবে আপনার আর আমার মূল দায়িত্ব কিন্তু সন্তানের এই দ্বীন, আখলাক এবং নৈতিকতার মূল শিকড় শক্ত করে দেওয়া।

তবে এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করা জরুরী। সন্তানের ফিতরাতকে সম্মান করার অর্থ এই নয় যে, সন্তান যা চাইবে তা-ই করতে দেওয়া হবে কিংবা সে কোনো ভুল বা হারাম পথ বেছে নিলেও আমরা অভিভাবকেরা চুপ করে তা মেনে নেব। সন্তান তার বয়সের অপরিপক্কতার কারণে কিংবা ভুল আকর্ষণে এমন কোনো পেশা বা পথ বেছে নিতেই পারে, যা শরীআহর দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ, কিংবা তার জীবন ও আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর।

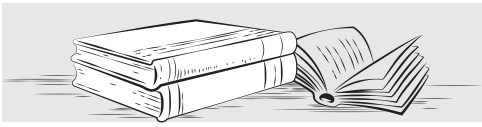
সেখানে অভিভাবকের ভূমিকা হবে একজন বিচক্ষণ পথপ্রদর্শকের (Guide)। আমাদের কাজ হলো শরীআহ ও দ্বীনের সীমারেখার ভেতরে থেকে সন্তানকে সঠিক ও ভুল পথের পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়া এবং তার রুচি ও প্রতিভাকে একটি অর্থপূর্ণ, হালাল ও কল্যাণকর দিকে পরিচালিত করা।

অতএব, সন্তান ভবিষ্যতে ডাক্তার হবে, মেকানিক হবে, শিক্ষক হবে কিংবা ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করবে। হালাল ও শরীআহসম্মত সীমারেখার মধ্যে থেকে তার আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা, ফিতরাত ও বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পথটি বেছে নিতে তাকে সাহায্য করাই হলো আসমানী প্রজ্ঞা।

(ইনশা-আল্লাহ! আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

৫৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩০০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৪৯।

www.al-itisam.com



শিক্ষার্থীদের পাতা

রাবীদের অদ্ভুত নামের রহস্য

-মাজহারুল ইসলাম আবির*

শায়খ আবূ আব্দুল আযীয মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী حفظه الله আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারস, ভারত ও আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, বাংলাদেশের স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ। হাদীছ ও উছূলে হাদীছের বেশ কিছু কিতাব তার কাছে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে, আল-হামদুলিল্লাহ। ২০২৫-এ আলিমিয়্যাহ ২য় বর্ষে উস্তাজি আমাদের সুনানে আবূ দাঊদ পড়াতেন। হাদীছ বর্ণনাকারীদের পুরো নাম বলা হাদীছের দারসে তার ব্যতিক্রম একটি বৈশিষ্ট্য। সনদে যখন আসত, হাদ্দাছানা মুসাদ্দাদ; তিনি তখন বলতেন, মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ ইবনে মুসারবাল ইবনে মুগারবাল আল-আসাদী আল-বাছারী। এভাবে একের পর এক রাবীর নাম অনর্গল বলতেন তিনি। মজার কথা হলো, মাঝে মাঝে রাবীদের কিছু অদ্ভুত নাম আসত। আশাজ্জ, আ‘রাজ, আ‘মা, রাহওয়াইহ, হাদ্দাদ, হাযযা, আবুল লাহম, বাতীন, গুনদার, বুনদার, মুতাইয়্যান—এরকম। এগুলোর বাংলা অর্থ খুবই বিচিত্র, যেমন- কপাল ফাটা, ল্যাংড়া, অন্ধ, পথজাত, কামার, জুতাওয়ালা, গোশতওয়ালা, ভুঁড়িওয়ালা, চঞ্চল, গুদামজাতকারী, কাদামাখা—এরকম। খুব জানতে ইচ্ছে হতো, এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত নাম কেন তাদের! নামগুলোর পিছনের রহস্য কী? উস্তাজিকে জিজ্ঞেস করে মাঝে মাঝে যখন নামকরণের কাহিনী শুনতাম, তখন খুব অবাক লাগত। সেই অবাক লাগা থেকেই শুরু হয় অনুসন্ধান। রাবীদের অদ্ভুত নামের রহস্য উদ্ঘাটনের অনুসন্ধান। সেগুলোই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে শেয়ার করব।

গুনদার (চঞ্চল):

গুনদার শব্দটি শুনতে বেশ মজার, তাই না? আমি হাদীছের দারসে ইবারত পড়ার সময় এই শব্দটি একটু হাইলাইট করে পড়ি। আরবী শব্দটির মতো এর বাংলা অর্থটিও বেশ মজার—সুদর্শন, লাবণ্যময় ও সতেজ তারুণ্যের অধিকারী যুবক। এ অর্থে আমরা সাধারণ বাংলায় বলতে পারি চঞ্চল, চটপটে বা দুষ্টু। মূলত এটি হাদীছের একজন রাবীর নাম, তার প্রকৃত নাম হলো মুহাম্মাদ ইবনু জা‘ফর আল-হুজালী। তাহলে তিনি এই আজব নামটি কীভাবে পেলেন?

তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইবনু জুরাইজের ছাত্র ছিলেন। আর তিনি ছিলেন পড়াশোনায় অদম্য কৌতূহলী এবং অনুসন্ধিৎসু। শায়খের কাছ থেকে হাদীছের সনদ সূক্ষ্মভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য তার তীব্র চঞ্চলতা ও আকুলতা ছিল। হেজাযের ক্লাসমেটদের সাথে তিনি ক্লাসে হাদীছ নিয়ে বেশ গভীর অনুধ্যান ও প্রশ্নোত্তরের কলরবে মেতে উঠতেন। জ্ঞানার্জনে তার এমন একনিষ্ঠ ব্যাকুলতা ও অধ্যবসায় দেখে উস্তায ইবনু জুরাইজ একদিন তাকে বলেছিলেন, ما أنت إلا غندر অর্থাৎ তুমি তো দেখছি একটা গুনদার (চঞ্চল ও চটপটে)। সেই থেকে তার নাম হয়ে যায় গুনদার। পরবর্তীতে উস্তাযের এই আদরের ডাকটিই হাদীছশাস্ত্রে তার মূল নামের চেয়েও বেশি বিখ্যাত হয়ে যায়।[৫৫]

বুনদার (গুদামজাতকারী):

গুনদারের মতোই আরেকটি নাম হলো বুনদার। আরবী ভাষায় বুনদার বলা হয় সেই ব্যবসায়ীকে, যে পণ্য মজুদ বা গুদামজাত করে রাখে। তাহলে কি এই রাবী ব্যবসায়ী ছিলেন? না, তিনি কোনো ব্যবসায়ী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন তাঁতি। তবে যেভাবে একজন বড় ব্যবসায়ী পুরো এলাকার পণ্য নিজের গুদামে জমা করে রাখেন, ঠিক তেমনই মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার ইবনে উছমান ইবনে দাঊদ ইবনে কায়সান তার শহর বাছরার এবং তার আশপাশের প্রায় সব হাদীছ নিজের স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা করে ফেলেছিলেন, তাই তাকে হাদীছের বুনদার (গুদামজাতকারী) বলা হতো। তিনি ছিলেন হাদীছের এক মহা সংগ্রহশালা। কুতুবুস সিত্তাহ’র ছয়জন মুহাদ্দিছের প্রত্যেকেই তার কাছে থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ رحمه الله বলেন, ‘আমি বুনদারের কাছ থেকে প্রায় ৫০ হাজার হাদীছ লিখেছি’। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় নিজ এলাকা থেকে বের হতে পারেননি, অথচ তিনি হাদীছের এক বিশাল ভাণ্ডার! কীভাবে? তার মা ছিলেন অসুস্থ। তিনি হাদীছ অন্বেষণের জন্য দূরদেশে সফর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অসুস্থ মাকে রেখে যেতে পারেননি। তিনি মায়ের সেবাযত্ন করতে থাকেন। মা মারা যাওয়ার পরই কেবল তিনি ইলমের সফরে

৫৪* অধ্যয়নরত, কুল্লিয়্যাহ ১ম বর্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৫৫. সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ৭/৫৩৪; ইয়াসীর আল-হামাদানী, হায়াতুত তাবেঈন, পৃ. ১০১৭।

www.al-itisam.com

বের হয়েছিলেন। মায়ের আনুগত্য ও সেবাযত্নের বরকতেই তিনি হাদীছে ভাণ্ডার (বুনদার) হয়ে উঠেছিলেন।[৫৬]

গুনজার:

গুনদার ও বুনদার-এর মতোই আজব আরেকটি নাম গুনজার। বুখারা অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা থেকে আরবীতে ঢুকে পড়া এই শব্দটি দ্বারা লালচে ভাব বা মহিলাদের একপ্রকার লাল প্রসাধনী বুঝানো হতো। অবাক করা কথা হলো, গুনজার রাবীর নাম; তাও আবার একজন নয়, দুই দুইজন রাবীর নাম! কেন এমন অদ্ভুত নাম হলো? কী তার কারণ?

হাদীছ শাস্ত্রের ইতিহাসে রাবীদের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার এক চমৎকার স্মারক এই গুনজার নামটি। তার আসল নাম ঈসা ইবনে মূসা আত-তায়মী। বুখারা অঞ্চলের একজন রাবী। গোলাপি গালের অধিকারী ছিলেন তিনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ফর্সা চেহারার মাঝে দুটি লালচে আভাযুক্ত স্নিগ্ধ গাল দিয়েছিলেন, সেই লালচে আভার কারণেই তিনি উপহার পেয়েছিলেন একটি সুন্দর নাম 'গুনজার'।

আরেকজন ছিলেন তারই ছাত্র। গুনজারের ছাত্র গুনজার। মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর ইবনে আহমাদ আল-বুখারী আল-ওয়াররাক। তিনি তার উস্তায গুনজারের (ঈসা ইবনে মূসা) হাদীছগুলো খুব নিষ্ঠার সাথে খুঁজে বেড়াতেন ও লিখে রাখতেন। তরুণ বয়সে তিনি এই কাজে এতটাই নিমগ্ন ছিলেন যে, নিজের নাম ছাপিয়ে তার নাম হয়ে যায় গুনজার। এভাবেই উস্তাযের হাদীছ অনুসন্ধান ও অধ্যবসায়ে অবিরাম মনোযোগের কারণে একজন ছাত্র শিক্ষার উত্তরসূরি হিসেবে পেয়ে যায় উস্তাযের নাম গুনজার (গোলাপি গালের অধিকারী)।[৫৭]

কাদামাখা ছেলে:

আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সুলায়মান আল-হাযরামী। তিনি কূফার এক প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ। তিনি লিখেছেন মুসনাদ ও তারীখ। ইমাম দারাকুত্বনীর মতে, তিনি নির্ভরযোগ্যতায় পাহাড়ের মতো শক্ত। তিনি হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন পাঁচ শতাধিক শায়খের কাছ থেকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো তার নাম মুতাইয়্যান, যার বাংলা অর্থ কাদামাখা। এমন একজন হাদীছের পণ্ডিতের নাম কাদামাখা! হ্যাঁ। এই নামটি শুধু নাম নয়, বরং এই নামের পিছনের গল্পটি ঘুরিয়ে দিয়েছিল তার জীবনের মোড়। কী ছিল সেই গল্প?

একবার তাকেই জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তার এই নাম সম্পর্কে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ছোটবেলায় আমি আমারই মতো বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করতাম। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা। আমরা একসাথে পানিতে ডুব-সাঁতার খেলতাম। আমার বন্ধুরা খেলার মাঝে আমার পিঠে কাঁদা মাখিয়ে দিত। একদিন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আবূ নুআইম ফযল ইবনু দুকাইন আমাকে দেখে বললেন, 'ইয়া মুতাইয়্যান! (হে কাদামাখা ছেলে!) তুমি ইলমের মজলিসে হাযির হও না কেন?' এই কথা শোনার পর আমার বোধোদয় হলো। এরপর আমি হাদীছ অন্বেষণ শুরু করলাম। কিন্তু আমার সেই অনুপ্রেরণাদাতা উস্তায আবূ নুআইমকে আমি পাইনি। ততদিনে তিনি মারা গেছেন।

এভাবেই একজন শিশুর কাঁদা মেখে খেলার দৃশ্য দেখে একজন উস্তাযের স্নেহের পরশে বলা একটি কথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল জীবনের মোড়। ছেলেবেলায় উস্তায আবূ নুআইমের মুখ থেকে আসা সেই 'মুতাইয়্যান' (কাদামাখা ছেলে) ডাকটিকেই তিনি স্মৃতি ও প্রেরণা হিসেবে বহন করেছেন সারাটি জীবন।[৫৮]

আতরদানি:

মুশকাদানাহ নামটি কত সুন্দর আর ইউনিক, তাই না? নামটি থেকেই যেন মিশকের সুবাস পাওয়া যাচ্ছে। মূলত নামটি দুইটি শব্দযোগে গঠিত। مُشْكدانَة = دَانَة+مُشْك। مُشْك (মুশক) শব্দটির বাংলা অর্থ কস্তুরী বা উন্নতমানের মৃগনাভি সুগন্ধি। আর دَانَة (দানাহ) শব্দের মানে হলো পাত্র, দানি বা আধার। অর্থাৎ 'মুশকাদানাহ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো কস্তুরীর পাত্র বা সুগন্ধির দানি (Perfume Holder)। অদ্ভুত কথা হলো, এটি একজন রাবীর নাম।

মুশকাদানাহ رحمه الله-এর আসল নাম আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবান আল-কূফী। ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও আবূ যুরআহ রাযী رحمهم الله-সহ অনেক মুহাদ্দিছ তার থেকে সরাসরি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন খুব পরিপাটি ও সুরুচিপূর্ণ। তিনি সবসময় পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত পোশাক পরিধান করতেন এবং নিজেকে সবসময় আতরের সুবাসে সুবাসিত করে রাখতেন। তার শায়খ ছিলেন আবূ নুআইম ফযল ইবনু দুকাইন। শায়খের হাদীছের দারসে বসার আগে তিনি নিজেকে অত্যন্ত পরিপাটি ও সুবাসিত করে তুলতেন। তাই আবূ নুআইম তাকে দারসে আসতে দেখলেই বলতেন, جاء مشكدانة অর্থাৎ 'ঐ যে, মুশকাদানাহ (আতরদানি) এসেছে!' সেই থেকে তিনি মুশকাদানাহ বা আতরদানি নামটি পরিগ্রহণ করেন।[৫৯]

৫৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৯/৫০৮।
৫৭. সামআনী, আল-আনসাব, ৯/১৭৭; তাহযীবুল কামাল, ২৩/৩৭।
৫৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১/২৮; ড. মাহমূদ আত্ব-ত্বহহান, তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ, পৃ. ২২২।
৫৯. ইবনু হিব্বান, ছিক্বাত, ৮/৩৫৮; আল-কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ৬/২৪২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৯/১৭৮।

www.al-itisam.com

পথহারা (الضَّال) ও দুর্বল (الضعيف):

একজন ছিলেন পথহারা, আর আরেকজন দুর্বল। অথচ তারা দুজনই ছিলেন হাদীছের নির্ভরযোগ্য রাবী। কী! আশ্চর্য মনে হচ্ছে? একজন যঈফ আবার কীভাবে ছিক্বাহ হয়! একজন পথহারা ব্যক্তি কীভাবে আবার হাদীছের রাবী হয়! চলুন তাহলে জেনে নিই পথহারা ও দুর্বল রাবীর পেছনের গল্প।

ক্লাসে যখন একই নামের দুজন ছাত্র থাকে, তখন তাদের নাম হয়ে যায় অমুক-১, অমুক-২। বাছরার মুহাদ্দিছ মুআবিয়া ইবনু আব্দুল কারীম আছ-ছাক্বাফী রহিমাহুল্লাহ-এর ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। তবে তার এই অদ্ভুত উপাধির পেছনের ঐতিহাসিক কারণটি ছিল নিতান্তই একটি ভৌগোলিক দুর্ঘটনা! তিনি একবার এক সফরে বের হন। সফরের ধুলোমলিন অলিতেগলিতে চলতে চলতে তিনি মক্কার রাস্তায় পথ হারিয়ে ফেলেন। সেই সফরে তার একজন পথসঙ্গীর নামও ছিল মুআবিয়া। ফলে কেউ যখন 'মুআবিয়া' বলে ডাক দিত, তখন অন্যজন সাড়া দিতেন। তাই দুই মুআবিয়ার মাঝে পার্থক্য করতে মানুষজন মক্কায় পথ হারিয়ে ফেলা মুআবিয়াকে বলতে শুরু করলেন, 'মুআবিয়া আয-যল' (পথহারা মুআবিয়া)।[৬০]

আরবী ভাষার অলংকারশাস্ত্রে একটি চমৎকার ব্যবহার আছে, تسمية الشيء بالضّدّ অর্থাৎ 'কোনো বস্তুকে তার বিপরীত শব্দে অভিহিত করা'। যেমন- চরম অন্ধ ব্যক্তিকে আশার ছলে 'বাছীর' (দৃষ্টিমান) বলা। বালাগাতের এই ব্যবহারটাই ব্যবহৃত হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আত-তারসূসী রহিমাহুল্লাহ-এর ক্ষেত্রে। ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ-এর ভাষ্যানুযায়ী, হাদীছ মুখস্থ ও সংরক্ষণে তার দক্ষতা এতটাই নিখুঁত ও প্রখর ছিল যে, অতিরিক্ত মেধার কারণে প্রশংসার রূপক হিসেবে তাকে 'যঈফ' (দুর্বল) বলা হতো।[৬১]

তাকে যঈফ নামকরণের আর একটি মত হলো, তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল ও ক্ষীণকায় ছিলেন। তার এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল দৈহিক স্বাস্থ্যের বর্ণনাস্বরূপ। হাদীছ বর্ণনায় বা সনদের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল ছিলেন, বিষয়টি মোটেও এমন না। বরং ইবনু হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ-এর মতে, তিনি ছিলেন ছিক্বাহ।[৬২]

জুতাওয়ালা:

ছহীহ বুখারীর ক্লাসে একবার এক রাবীর নাম আসে خالد الحذاء (জুতাওয়ালা খালেদ)। আরবী الحذاء শব্দের অর্থ হলো জুতা। আর জুতা যে তৈরি করে বা সেলাই করে, তাকে বলা হয় الحذاء তথা জুতাপ্রস্তুতকারী। রাবীর নামটি পড়েই শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী উস্তাযী রহিমাহুল্লাহ মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'তাহলে এই রাবী মুচি ছিলেন নাকি গো?' এরপর তিনি আমাদের বললেন, 'তিনি জীবনে কোনোদিন একটি জুতাও তৈরি করেননি। কখনো কোনো জুতা বিক্রিও করেননি। তিনি কেবল বাছরার জুতাবাজারে গিয়ে মুচিদের পাশে বসে থাকতেন বলে মানুষ তাকে الحذاء (জুতাওয়ালা) ডাকা শুরু করে'।

তার পুরো নাম হলো খালেদ ইবনে মেহরান আল-বাহরী। তার মুখস্থশক্তি ছিল বেশ গভীর। জীবনে কখনো তিনি কিছু লিখে রাখেননি। শুধু একটি দীর্ঘ হাদীছ লিখেছিলেন। এরপর সেটি মুখস্থ হয়ে যাওয়ার পর লেখাটি মুছে দিয়েছিলেন।

তার এই অদ্ভুত নামের আরেকটি বৈচিত্র্যময় ব্যাখ্যা আছে। তিনি বনূ মুজাশি' গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। আর তার শ্বশুরবাড়ি ছিল মুচিপাড়ায় (হাযযাঈন এলাকায়)। বিয়ের পর তিনি স্ত্রীর সাথে শ্বশুরবাড়ি মুচিপাড়ায় থাকতে শুরু করেছিলেন। সেই এলাকার নামানুসারেই তার নাম হয়ে যায় আল-হাযযা (মুচি)।[৬৩]

বজ্রপাত:

মেঘের ঘনঘটায় অন্ধকার হয়ে আসা আকাশে গুড়মুড়িয়ে এক ঝিলিকে আলোর ঝলকানি হয়ে চমকে ওঠে বিজলি, আর মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে যায় পৃথিবী। তারপর বাতাসে হুড়মুড়িয়ে শুরু হয় বৃষ্টির ঝাপটা। বিজলি তো আকাশেই দেখা যায়। বৃষ্টির আগমুহূর্তে মেঘের আড়াল থেকে বিদ্যুতের চমকের মতো এই যমীনের বুকেও বিচরণ করত এক বিজলি বা বজ্রপাত। হ্যাঁ, তার নামই ছিল ছায়েক্বাহ (صاعقة), বাংলায় যার অর্থ বজ্রপাত বা বিজলি।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহীম আল-বাগদাদী, পেশায় তিনি ছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী (বাযযায)। কিন্তু হাদীছের জগতে তার পরিচয় কাপড়ের ব্যবসায়ী হিসেবে নয়; বরং আকাশ চিরে ছুটে আসা বজ্রপাতের নামে। কিন্তু কেন তাকে বজ্রপাত (ছায়েক্বাহ) বলা হতো?

কারণ তার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ, ধারণশক্তি ছিল বিস্ময়কর, মুখস্থশক্তি ছিল দুর্দান্ত, মেধাশক্তি ছিল তীব্র ও ক্ষিপ্র, আর স্মরণশক্তি ছিল বজ্রের ঝলকের মতোই তীক্ষ্ণ। হাদীছ সংরক্ষণ ও স্মরণে তার দক্ষতা ছিল এতটাই প্রখর যে, মুহাদ্দিছগণ তাকে বজ্রপাত (ছায়েক্বাহ) নামে অভিহিত করেছিলেন।[৬৪]

৬০. তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ২৮/১৯৯।
৬১. তাহযীবুত তাহযীব, ২/৪২৭।
৬২. তাকরীবুত তাহযীব, ১/৫৪৩।
৬৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/১৯৬।
৬৪. তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ৮/২৬।

ইলমুল হাদীছের অনন্য সাধক শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ

-ড. নুর মোহাম্মদ*

ভূমিকা:

শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীছবিশারদ। ইলমুল হাদীছে তার অবদান অসামান্য রয়েছে। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় হাদীছচর্চায় উৎসর্গ করেছেন। হাদীছ অধ্যয়ন, শিক্ষাদান, গবেষণা ও লেখালেখিই ছিল তার জীবনের প্রধান ব্রত। হাদীছশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তার সরব বিচরণ ইলমুল হাদীছে তার বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

তিনি সনদের মান যাচাই করে ছহীহ ও যঈফ (দুর্বল) হাদীছের পৃথক সংকলন প্রণয়ন করেন। ছহীহ হাদীছভিত্তিক তার অনবদ্য সংকলন 'সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ' এবং দুর্বল ও জাল (মাওযূ') হাদীছের সংকলন 'সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূআহ'—হাদীছের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও সাধারণ পাঠকের কাছে হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ণয়ের একটি নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হিসেবে সমাদৃত।

হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নিরূপণে তার সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ, হাফেয ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ মনীষীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার এ অনন্য অবদানের কারণে আধুনিক বিশ্বে তাকে ইলমুল হাদীছ, বিশেষত ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল-এর একজন অসাধারণ বিশেষজ্ঞ আলেম হিসেবে গণ্য করা হয়।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীছের শিক্ষক হিসেবে তার নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কারে ভূষিত হওয়া ইসলামী জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও প্রচার-প্রসারে তার অসামান্য অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বহন করে।

শৈশবকাল:

শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন। তিনি ১৩৩২ হিজরী (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে) আলবেনিয়ার প্রাচীন রাজধানী আশকুদরাহ নগরীর এক সম্ভ্রান্ত, ধর্মপরায়ণ কিন্তু দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-এর পিতা নূহ নাজাতী ছিলেন একজন প্রথিতযশা আলেম। তিনি তৎকালীন শিক্ষাদীক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আলবেনিয়ায় ফিরে এসে দ্বীনের খেদমত, শিক্ষা প্রদান এবং জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

স্বাভাবিকভাবেই বালক আলবানী শৈশব থেকেই ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার পরিবেশে বেড়ে ওঠেন, যা তার ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানজীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।[৬৬]

হিজরত:

শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ প্রায় ৯ বছর বয়স পর্যন্ত আলবেনিয়ায় অবস্থান করেন। এ সময় 'আহমাদ জুগু' নেতৃত্বাধীন সরকার দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি করে। যেমন- নারীদের হিজাব নিষিদ্ধ করেন এবং পুরুষদের জন্য পাশ্চাত্য ধাঁচের পোশাক পরিধান করা বাধ্যতামূলক করে দেন, এমনকি আরবী ভাষার পরিবর্তে আলবেনীয় ভাষায় আযান দেওয়ার নির্দেশ দানের মতো ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করেন।[৬৭]

এতে ধর্মপরায়ণ অন্যান্য মুসলিমের পাশাপাশি শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-এর পিতা নূহ নাজাতীও মর্মাহত হন এবং দ্বীনের উপর টিকে থাকা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি দ্বীনের স্বার্থে এবং আসন্ন ফিতনা থেকে নিজ পরিবারকে রক্ষার্থে হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সপরিবারে সিরিয়ার দামেস্কে চলে যান।[৬৮]

শিক্ষাজীবন:

সিরিয়ায় আগমনের পর তার জন্য আরবী ভাষা এবং মূল উৎস থেকে শরীআতের জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম হয়ে যায়। তার পিতা তাকে দামেস্কের প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'জমঈয়তুল ইস'আফিল খয়রিয়্যাহ আত-তা'লীমিয়্যাহ' (جمعية الإسعاف الخيرية التعليمية)-এ

৬৫* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম।

৬৬. আশ-শায়বানী, মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম, হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু ওয়া ছানাউল উলামায়ি আলাইহি, (কায়রো: মাকতাবাতুস সাদ্দাবী, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৪৪।

৬৭. আবূ নাছির ইবরাহীম আব্দুর রঊফ ও আবূ মারইয়াম মুসলিম আমীন, The Biography of Great Muhaddith Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৯।

৬৮. উমরী মাদানী, মাওলানা আব্দুল আযীম, মুহাদ্দিছ আছর আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ, (কর্নাটক: দারুল হুদা, ১৪৩০ হি.), পৃ. ৫।

www.al-itisam.com

ভর্তি করে দেন। সেখানে তিনি প্রথম বছরেই প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পাঠক্রম সম্পন্ন করেন। ফলে মাত্র চার বছরেই অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[৬৯] শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ -এর পিতা অনুভব করলেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী শরীআতের প্রকৃত ও যোগ্য আলেম গড়ে ওঠা দুরূহ। সন্তানকে আলেম বানানোর তার এই প্রত্যাশা হয়তো পূরণ হবে না। সুতরাং প্রাথমিক স্তরেই তিনি পুত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি টানেন। মাধ্যমিক স্তরে সন্তানকে ভর্তি না করিয়ে তিনি নিজেই একটি শিক্ষা সিলেবাস তৈরি করে তাকে শিক্ষাদান শুরু করেন।[৭০]

শিক্ষকবৃন্দ:

প্রাথমিক স্তরেই শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ -এর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটলে গতানুগতিক লেখাপড়ার গণ্ডি মুক্ত হয়ে ব্যাপক আকারে জ্ঞানার্জনের পথ উন্মুক্ত হয়। তিনি পিতার কাছ থেকে কুরআন হিফয করেন এবং হানাফী ফিক্বহ, যেমন- মুখতাছারুল কুদূরী, নাহু, ছরফ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।[৭১] অতঃপর জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে পিতার বন্ধু শায়খ সাঈদ আল-বুরহানীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে শায়খ বদরুদ্দীন আল-হাসানী, শায়খ মুহাম্মাদ রাগিব আত-তাব্বাখ আল-হালাবী, মুহাম্মাদ বাহজা আল-বায়তার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৭২] এছাড়া যেসব মনীষীর সান্নিধ্যে এসে তিনি স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন তারা হলেন- শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে বায, ড. ইউসূফ আল-কারযাভী, শায়খ হামিদ, আব্দুর রাযযাক হামাযাহ, ড. ত্বাকীউদ্দীন আল-হিলালী আস-সালাফী, মুহাম্মাদ আল-মুবারক, মুহিব্বুদ্দীন আল-খত্বীব, ড. মুছত্বফা আল-আ'যমী, ড. উমার সুলায়মান আল-আশকার প্রমুখ।[৭৩] তিনি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদি থেকেই জ্ঞান আহরণের উপর গুরুত্ব দিতেন বেশি। তিনি তার শিক্ষার আসরগুলোতে প্রায় বলতেন, إِنَّ الْعِلْمَ بَحْثٌ অর্থাৎ জ্ঞান তো গবেষণা-ই।[৭৪]

জ্ঞানপিপাসু শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ :

শৈশবকাল থেকেই শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। জ্ঞানার্জনের প্রতি ছিল তার প্রবল আকর্ষণ। তিনি পিতার দোকানে ঘড়ি মেরামতের কাজে সহযোগিতা করতেন। ঘড়ি মেরামতের সময় ব্যতীত বাকি সময় তিনি জ্ঞানার্জন, রচনা, হাদীছের কিতাবসমূহ পাঠ, বিশেষত দামেস্কের বিখ্যাত পাঠাগার 'যাহিরিয়্যা লাইব্রেরি'তে রক্ষিত হাদীছের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করতেন। সেখানে তিনি ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা, কোনো কোনো সময় ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত অধ্যয়ন করতেন।[৭৫] জ্ঞান-গবেষণায় শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ -এর প্রবল আগ্রহ দেখে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ তার জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ দেন এবং তার চাবিও তাকে দিয়ে দেন, যাতে তিনি নির্বিঘ্নে তার অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।[৭৬] এছাড়াও তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ কয়েকটি লাইব্রেরিতে গিয়ে অধ্যয়ন, অনুবাদ, বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। জ্ঞানচর্চায় শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ -এর অনুসন্ধিৎসু মন এতটা ব্যাকুল ছিল যে, এক সময় তিনি ইবনু আবিদ দুনইয়া রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত ذَمُّ الْمَلَاهِيْ এর পাণ্ডুলিপির হারিয়ে যাওয়া একটি পৃষ্ঠা উদ্ধারের জন্য তিনি 'যাহিরিয়্যা লাইব্রেরি'র প্রায় ১০ হাজার বই তন্নতন্ন করে খোঁজেন।[৭৭]

ইলমুল হাদীছের প্রতি মনোনিবেশ:

প্রখ্যাত আরবী ম্যাগাজিন 'আল-মানার'-এর একটি সংখ্যায় ইমাম আল-গাযালী রচিত إِحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ এর সমালোচনায় রশীদ রিযার লিখিত একটি প্রবন্ধ শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ -এর মনে গভীর রেখাপাত করে। এ প্রবন্ধে রশীদ রিযা উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে আবুল ফাযল যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী রাহিমাহুল্লাহ الْمُغْنِيْ عَنْ حَمْلِ الْأَسْفَارِ فِي الْأَسْفَارِ فِيْ تَخْرِيْجِ مَا فِي الْإِحْيَاءِ مِنَ الْأَخْبَارِ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৭৮] যাতে আল্লামা ইরাকী إِحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ গ্রন্থে উল্লেখকৃত হাদীছের মধ্যে কোনটি ছহীহ ও কোনটি যঈফ তা নিরূপণ করেছেন। প্রবন্ধটি পড়ে শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীছের

৬৯. আল-আয়যারী, আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ, জুহূদুশ শায়খিল আলবানী ফীল হাদীছ রিওয়ায়াতান ওয়া দিরায়াতান, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২৭ হি.), পৃ. ৩৬।

৭০. আস-সাদহান, আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ, আল-ইমামুল আলবানী দুরূসুন ওয়া মাওয়াক্বিফু ওয়া ইবারুন, (রিয়াদ: দারুত তাওহীদ, ১৪২৯ হি.), পৃ. ১৪।

৭১. আল-মুনাজ্জিদ, মুহাম্মাদ ছালেহ, ইহদাছু মুছীরাতিন ফী হায়াতিশ শায়খ আল-আল্লামাতিল আলবানী, (আলেকজান্দ্রিয়া: দারুল ঈমান), পৃ. ১০।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৭৩. আশ-শায়বানী, হায়াতুল আলবানী, পৃ. ৬৪-৬৯।

৭৪. আল-আয়যারী, জুহূদুশ শায়খিল আলবানী, পৃ. ৪৪।

৭৫. আশ-শায়বানী, হায়াতুল আলবানী, পৃ. ৪৮-৪৯।

৭৬. আল-মিছরী, আবূ আসমা আতিয়্যাহ, কাতফুছ ছিমার বিআখিরি মা হাদ্দাছা বিহী শায়খুনাল আলবানী মিন আখবারি সাফাহাতি বায়দা মিন হায়াতিল ইমাম মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী, (সানা: দারুল আছার, ১৪২২ হি.), পৃ. ৩৪।

৭৭. আস-সাদহান, আল-ইমামুল আলবানী, পৃ. ৫৪-৫৫; আল-মুনাজ্জিদ, ইহদাছু মুছীরাতিন ফী হায়াতিশ শায়খ, পৃ. ১৮।

৭৮. আল-কারযূবী, ড. আছিম আব্দুল্লাহ, তারজুমাতু মুজাযাতি লি ফাযীলাতিল মুহাদ্দিছ আশ-শায়খ আবী আব্দির রহমান মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, (জেদ্দা: দারুল মাদানী), পৃ. ৫।

www.al-itisam.com

জ্ঞানার্জন ও গবেষণায় আত্মোৎসর্গে সংকল্পবদ্ধ হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, اَلشَّاهِدُ أَنَّ مَجَلَّةَ الْمَنَارِ هِيَ الَّتِيْ فَتَحَتْ لِيَ الطَّرِيْقَ لِلْاِشْتِغَالِ بِعِلْمِ الْحَدِيْثِ। অর্থাৎ বস্তুত আল-মানার পত্রিকাটি ইলমুল হাদীছের প্রতি মনোনিবেশে আমার পথকে উন্মুক্ত করে দেয়।[৭৯] তিনি আল্লামা ইরাকী রহিমাহুল্লাহ রচিত গ্রন্থটি ভাড়ায় সংগ্রহ করেন এবং মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে গ্রন্থটির উপর টীকা সংযোজন করে একটি কপি তৈরি করেন।[৮০] এর মাধ্যমেই তিনি লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন এবং নিজেকে ইলমুল হাদীছের সাথে সম্পৃক্ত করেন।

হাদীছের ব্যাপক গবেষণা:

হাফেয আল-ইরাকী রহিমাহুল্লাহ রচিত اَلْمُغْنِيْ গ্রন্থের বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের মর্ম উদ্ধারপূর্বক গ্রন্থটির টীকা সংযোজনের লক্ষ্যে অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বহুমুখী জ্ঞানার্জনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন, যা তার জ্ঞানের জগৎকে সমৃদ্ধ করে।[৮১] এরই ধারাবাহিকতায় তিনি হাদীছের উপর জ্ঞান-গবেষণায় আরও বেশি নিমগ্ন হন। মাত্র ২২ বছর বয়সেই তিনি اَلرَّوْضُ النَّضِيْرُ فِيْ تَرْتِيْبِ وَتَخْرِيْجِ مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الصَّغِيْرِ নামক হাদীছগ্রন্থের تخريج সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৮২] সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন বিদআত ও ধর্মের নামে কুসংস্কারের ছড়াছড়ি দেখে মর্মাহত শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ কুরআনের আয়াত ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে মসজিদে কবর স্থাপন হারাম প্রমাণ করে রচনা করেন تَحْذِيْرُ السَّاجِدِ مِنْ اِتِّخَاذِ الْقُبُوْرِ مَسَاجِدَ নামক গ্রন্থটি।[৮৩] পরবর্তীতে এই মূল্যবান গ্রন্থটি ‘কবর ও মাযার সংলগ্ন মসজিদে ছালাত আদায়ে সতর্ক হোন’ নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

দারস প্রদান:

শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনা করে প্রচলিত বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি ও গোঁড়ামি নিয়ে যখন কলম ধরলেন, তখন তার জ্ঞানগরিমার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাদীছের শিক্ষার্থীরা হাদীছের জ্ঞান আহরণে তার কাছে ভিড় জমাতে শুরু করেন। তাদের জ্ঞানপিপাসা মেটানোর জন্য শায়খ সপ্তাহে দুটি শিক্ষার আসর চালু করেন। যাতে তিনি ইলমুল হাদীছের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার পাশাপাশি আক্বীদা, ফিক্বহ, উছূলুল ফিক্বহ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। আর এতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও তার দারসে উপস্থিত হতেন। পাঠদানে তার সচেতনতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা বিজ্ঞজনদের বিস্ময়াভিভূত করে তোলে।

এ প্রসঙ্গে তার ছাত্র সামীর ইবনু আমীন বলেন, তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। তার প্রখর মেধা ও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির কথা চিন্তা করলে যে কেউ নিঃসন্দেহে বিস্মিত হবেন। শায়খ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে ছালাত বা আহারের জন্য বিরতিতে গেলে ফিরে এসে ঠিক সেই স্থান থেকেই পাঠ শুরু করতেন, যেখানে বিরতির আগে থেমেছিলেন। মনে হতো, যেন তিনি পাঠদান থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরতি নেননি।[৮৪]

দাওয়াতী সফর:

তাওহীদ ও সুন্নাহর প্রচার-প্রসারকে বেগবান করার লক্ষ্যে শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল, যেমন- আলেপ্পো, লাতাকিয়্যা, ইদলিব, সালামিয়্যাহ, হোমস, হামা ও রাক্কা প্রভৃতি এলাকায় দাওয়াতী সফরে বের হতেন। এসব সফরে তিনি হাদীছের পাঠদানের পাশাপাশি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ, তাক্বলীদ, সুফীবাদ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আড়ালে প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে আলোচনা উপস্থাপন করতেন। তার এসব শিক্ষাদানের আসরে বিপুল সংখ্যক জ্ঞানপিপাসু মানুষের সমাগম ঘটত।[৮৫]

কারাজীবন:

বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালালে প্রতিপক্ষের চক্ষুশূলে পরিণত হন শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ। তারা যুক্তি খণ্ডনে ব্যর্থ হয়ে প্রশাসনকে তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। ১৯৬৭ সালে তাকে গ্রেফতার করা হলে বিভিন্ন দেশে তার মুক্তির কথা বলা হতে থাকে। কোনো দোষ প্রমাণ করতে না পারায় এক মাস পরে মুক্তি পেলে শায়খ আলবানী রহিমাহুল্লাহ নব উদ্যমে তার দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আবারও গ্রেফতার হন। এ সময় তার সাথে ছিল ছহীহ মুসলিম। তিনি তার এ কারাবাসকে জ্ঞান গবেষণার জন্য নির্জন স্থান হিসেবে বেছে নিলেন। প্রায়শই তিনি কুরআনে বর্ণিত ইউসুফ আলাইহিস সালাম -এর এ উক্তিটি বলতেন, ﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ ‘হে আমার প্রভু! তারা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করে তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে অধিক প্রিয়’ (ইউসুফ, ১২/৩৩)। তিনি কারাগারে রাতদিন বিরামহীন পরিশ্রম করে মাত্র তিন মাসের মধ্যে ছহীহ মুসলিমের تحقيق সম্পন্ন করেন এবং مُخْتَصَرُ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ প্রণয়ন করেন।[৮৬]

৭৯. আস-সাদহান, আল-ইমামুল আলবানী, পৃ. ৩১।
৮০. আল-আয়যারী, জুহূদুশ শায়খিল আলবানী, পৃ. ৩৭।
৮১. আস-সাদহান, আল-ইমামুল আলবানী,পৃ. ৩০।
৮২. আল-মুনাজ্জিদ, ইহদাছু মুছীরাতিন ফী হায়াতিশ শায়খ, পৃ. ১৩।
৮৩. আল-মিছরী, কাতফুছ ছিমার, পৃ. ২৭।
৮৪. আবূ নাছির ইবরাহীম আব্দুর রঊফ ও আবূ মারইয়াম মুসলিম আমীন, The Biography of Great Muhaddith Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২১।
৮৫. হাদী, ইসাম মূসা, The Life of Sheikh Al-Albaani In His Own Words, (আম্মান: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৯।
৮৬. আশ-শায়বানী, হায়াতুল আলবানী, পৃ. ৬১৩।

www.al-itisam.com

বন্দিজীবনকে তিনি তাদের কাছে দ্বীনের বিষয়সমূহ তুলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। কারণ বাইরে থাকাবস্থায় তা সম্ভব হতো না। কিছুদিন পর মুক্তি পেলে তিনি আবারও গবেষণা, পাঠদান ও দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন। বিভিন্ন চেষ্টা চালিয়ে তাকে যখন তার দাওয়াতী মিশন থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি, তখন সরকার তার দাওয়াতী সফর দামেস্কে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে আদেশ জারি করেন।[৮৭]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান:

শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-এর কিছু বস্তুনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হলে তা বিজ্ঞজনদের নজরে পড়ে। তারা তার জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। বিষয়টি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়ায়নি। তারা উদীয়মান এ হাদীছবিশারদকে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীছ বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তিনি ১৩৮১-১৩৮৩ হিজরী (১৯৬১-১৯৬৩ খ্রি.) পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে হাদীছের পাঠদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জগতে তিনিই সর্বপ্রথম عِلْمُ الْإِسْنَادِ তথা হাদীছের বর্ণনাসূত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের উপর শিক্ষাদান করেন, যা ইতঃপূর্বে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়েও চালু ছিল না।[৮৮] এছাড়া তিনি ১৩৯৫-১৩৯৮ হিজরী পর্যন্ত মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ:

ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে অবদানের জন্য শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-কে ১৪১৯ হিজরীতে (১৯৯৯ খ্রি.) আরব বিশ্বের নোবেল খ্যাত আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাকে প্রদত্ত পুরস্কারের প্রশংসাপত্রে লেখা ছিল, 'প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে হাদীছের তাহক্বীক্ব, তাখরীজ ও গবেষণার ক্ষেত্রে এবং হাদীছের খেদমতে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ সিরিয়ার নাগরিক সম্মানিত শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীকে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হলো'।

শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের অভিমত:

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও হাদীছবিশারদ শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় মেধা ও সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির মাধ্যমে ইলমুল হাদীছে যে অবদান রেখেছেন, তাতে অভিভূত আলেমসমাজ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। যেমন- শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ مِثْلَ الْعَلَّامَةِ مُحَمَّد نَاصِرِ الدِّينِ الْأَلْبَانِيِّ 'আকাশের নিচে হাদীছের জগতে আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আল-আলবানীর মতো হাদীছে পারদর্শী আর কাউকে আমি দেখিনি'।[৮৯] শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, إِنَّهُ ذُو عِلْمٍ جَمٍّ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً 'হাদীছের রিওয়ায়াত ও দিরায়াতে তিনি ছিলেন বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী'।

মৃত্যু:

শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ জীবনের শেষ দিনগুলো জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অতিবাহিত করেন। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীছবিশারদ এই মনীষী ১৪২০ হিজরীর ২২ জুমাদাল আখের (১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর, শনিবার) আছরের পর আম্মানে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

তার অছিয়ত অনুযায়ী বিলম্ব না করে এশার ছালাতের পরপরই তাকে দাফন করা হয়।[৯০]

উপসংহার:

শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ এবং এক অনন্য সাধারণ মুসলিম মনীষী। তিনি তার জীবন, সাধনা ও কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, একনিষ্ঠ অধ্যবসায়, আন্তরিকতা এবং সত্যের অনুসন্ধিৎসা থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি বা পদ-পদবিই জ্ঞানার্জনের একমাত্র মানদণ্ড নয়। নিরলস অধ্যয়ন, গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি হাদীছশাস্ত্রে এমন এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হন, যা তাকে সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীছবিশারদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হাদীছের তাহক্বীক্ব, তাখরীজ এবং ছহীহ-যঈফ নির্ণয়ে তার অসামান্য অবদান ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এবং গবেষকদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তার রচিত গ্রন্থসমূহ আজও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের আলেম, গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ভরযোগ্য গবেষণাসামগ্রী হিসেবে সমাদৃত। তার ইলমী অবদান যুগের পর যুগ মুসলিম উম্মাহর জন্য জ্ঞানের বাতিঘর হয়ে থাকবে, ইনশা-আল্লাহ!

৮৭. হাদী, The Life of Sheikh Al-Albaani, পৃ. ১১।
৮৮. আল-মিছরী, কাতফুছ ছিমার, পৃ. ৪০-৪২।
৮৯. আশ শায়বানী, হায়াতুল আলবানী, পৃ. ৬৫-৬৬।
৯০. আল-আলী, ইবরাহীম মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী মুহাদ্দিছুল আছরি, (দামেস্ক: দারুল কলম, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৫২।

কবিতা

প্রার্থনা

-মোখতারুল ইসলাম মিলন
শিক্ষার্থী, শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকা।

আমি হঠাৎ পথ ভুলে যাই
আলোর থেকে দূরে,
তবুও প্রভুর দয়ার চাদর
আগলে রাখে মুড়ে।
জীবন ভরে যা করেছি
আমলনামায় জমা,
লক্ষ-কোটি পাপ করেছি
নেই যে দাড়ি-কমা।
আঁধার রাতে হাত বাড়িয়ে
কাঁদি তোমার দ্বারে,
তুমি ছাড়া কে আর আছে
নাজাত দিতে পারে?
নূরের ছোঁয়া দাও মাখিয়ে
পাপকে মোচন করে,
তোমার যিকির বাজুক দিলে
জাহান্নামের ডরে।
মিনায যুলূমাত ইলান নূর
জাগায় নতুন আশা,
হে দয়াময়, চাই যে সদা
তোমার ভালোবাসা।

দম্ভের শেষ পরিণতি

-আব্দুল ওয়াদুদ বিন আবূ বকর
শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

অহংকারে যে মাথা উঁচু করে,
সেই একদিন নিচে পড়ে।
গর্বের প্রাসাদ যতই হোক উঁচু,
পতনের শব্দ ততই হয় গুরু।
অহংকার মানুষকে অন্ধ করে,
সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে ধরে।
নিজেকে বড় ভাবার সেই ভুলে,
মানুষ হারায় নিজের মূল্যে।
যে নিজেকে সবার চেয়ে বড় ভাবে,
সে-ই সবচেয়ে বেশি হারায় শেষে।
দম্ভের আগুন ভিতরে জ্বলে,
শান্তি সবই ছাই হয়ে চলে।
নম্রতা মানুষকে দেয় সম্মান,
ভালোবাসায় ভরে তার প্রাণ।
অহংকার শুধু আনে লজ্জা,
শেষে দেয় কষ্টের সাজা।
তাই ছেড়ে দাও গর্বের পথ,
নম্রতায় খুঁজে নাও জীবনের রথ।
মনে রেখো এই সত্য বাণী—
অহংকারই পতনের টানি।

আল-ইতিছাম: আলোর দিশারী

-আবূ আফরা, নাটোর।

দশ বছরের দীপ্তি নিয়ে,
তোমার আলো জ্বলে বিশ্বজুড়ে।তাওহীদের বার্তা হৃদয়ে তুলি,
শিরক-বিদআতের আঁধার দূরি।
কুরআন-সুন্নাহর মশাল হাতে,
তুমি পথ দেখাও সত্যের পথে।
প্রতিটি সংখ্যা জ্ঞানের সুধা,
পাঠকের হৃদয় করে উদ্ভাসিত সদা।
তোমার শ্রম, ত্যাগ, অঙ্গীকার,
বয়ে আনে শান্তি, তৃপ্তি অপরিসীম প্রহর।
আলোর ফেরিওয়ালা, মেধার সমাহার,
তোমায় দেখে ওঠে সবাই সজাগ।
হে আল-ইতিছাম, এগিয়ে যাও!
বিশুদ্ধ জ্ঞানের বীজ রোপাও।
অন্ধকারে তুমি এক দীপ্ত তারা,
ইসলামের পথে জাগাও সাড়া।
দশ বছরের গৌরবের পালক,
তোমার যাত্রা হোক আরও অটল।
আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে চলো,
নব দিগন্তে জ্বালো নতুন আলো।

সংবাদ

বাংলাদেশ সংবাদ

রক্তাক্ত শৈশব: শিশু অপরাধের ভয়াল থাবা ও প্রশাসনের উদাসীনতা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে শিশু অপহরণ, নিখোঁজ, পাশবিক ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম আট মাসে সারা দেশে অন্তত ১৫৫ জন শিশু হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে নিখোঁজের পর ৩৬ জনের মরদেহ উদ্ধার এবং ২৪ শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। তাছাড়া, পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের প্রথম সাত মাসেই দেশজুড়ে ১৫,৭১৭টি শিশু নিখোঁজের সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং টিকটক-লাইকির অপসংস্কৃতিকে পুঁজি করে শহর থেকে গ্রামে বিস্তৃত হচ্ছে 'কিশোর গ্যাং'। এই গ্যাংগুলো মাদক কারবার, চাঁদাবাজি এবং সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে, যার বড় উদাহরণ কুমিল্লার কিশোর অপ্রতিম হত্যাকাণ্ড। প্রচলিত গণমাধ্যম ও ফেসবুক-ইউটিউবের মতো সামাজিক মাধ্যমে ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর আহাজারি প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে। নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীদের মতে, থানা-পুলিশের সময়মতো জিডি বা মামলা না নেওয়ার প্রবণতা, লজিস্টিক সহায়তার অভাব এবং আইনি দীর্ঘসূত্রতা এই অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সরকারের চরম ব্যর্থতাকে স্পষ্ট করে তোলে। আইনের কঠোর প্রয়োগ ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত না হলে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক চরম নিরাপত্তাহীনতার মুখে পতিত হবে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট: গভীর খাদের কিনারায় বিশ্ব অর্থনীতি

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের নাম বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট। ইউক্রেন যুদ্ধের পাশাপাশি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাঈল বনাম ইরান যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার জেরে বিশ্বজুড়ে তেল ও গ্যাসের সরবরাহ শৃঙ্খল মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের মোট তেল ও গ্যাস সরবরাহের প্রায় ২০-৩০ শতাংশ যে হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়, সেখানে অস্থিরতা তৈরি হওয়া এবং লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি হওয়াই এই সংকটের মূল কারণ। বর্তমানে এই সংকট এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডিজেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (LNG) দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (OECD) তথ্যমতে, তীব্র জ্বালানি সংকটের জেরে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার গত বছরের ৩.৪ শতাংশ থেকে কমে ২.৯ শতাংশে নেমে আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের বহু দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং অনেক দেশ বাধ্য হয়ে কোটা পদ্ধতি চালু করছে। জ্বালানি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে প্রতিটি খাতে। সরবরাহ কমার কারণে বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি চরম আকার ধারণ করেছে, যার চাপ সরাসরি পড়ছে সাধারণ মানুষের বাজারের ব্যাগে। পরিবহন খরচ এবং কৃষি খাতে সেচ ও সারের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো ডলার সংকটের পাশাপাশি জ্বালানি আমদানির অতিরিক্ত ব্যয়ে তীব্র অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়েছে।

এই সংকট থেকে উত্তরণের প্রধান উপায় হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানির (সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ) ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (IEA) সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরিবহন, কৃষি ও শিল্প খাতে জীবাশ্ম জ্বালানি বাদ দিয়ে দ্রুত বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করলে ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলো সম্মিলিতভাবে বছরে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় বাঁচাতে পারবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক কূটনীতি জোরদার করে সরবরাহ রুটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নতুন বিকল্প জ্বালানি উৎসে বিনিয়োগ বাড়ানোই পারে বিশ্বকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে খারেজী মাদরাসা বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কি গভীর ষড়যন্ত্র?

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফায় ২৫২টি ঐতিহ্যবাহী খারেজী মাদরাসা বন্ধের সরকারি নির্দেশ এবং ১০০টি মাদরাসা শোকজের ঘটনা রাজ্যজুড়ে তীব্র বিতর্কের ঝড় তুলেছে। বিশেষ করে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের মতো সংখ্যালঘু প্রধান জেলাগুলোতে গণঅসন্তোষ চরম আকার ধারণ করেছে। শত শত বছর ধরে এই খারেজী মাদরাসাগুলো সম্পূর্ণ স্বাবলম্বীভাবে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মুসলিম শিশুদের বিনামূল্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও নৈতিক আদর্শ প্রদান করে আসছে। 'মাদরাসা বাঁচাও কমিটি' ও 'অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরাম'-এর মতো শীর্ষস্থানীয় সংগঠনগুলোর অভিযোগ, আধুনিকীকরণের খোঁড়া অজুহাতে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্তব্ধ করা আসলে মুসলিম সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে দূরে রাখার এক সুগভীর ব্লুপ্রিন্ট। তৃণমূল ও বামপন্থি দলগুলোর একাংশও একে ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর আঘাত বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

মুসলিম বিশ্ব

কড়া পাহারায় আল-আক্বছায় ১৫০০ ইয়াহূদীর অনুপ্রবেশ, ফিলিস্তীনিদের ক্ষোভ

ইসরাঈলি পুলিশের কড়া পাহারায় জেরুযালেমের পবিত্র আল-আক্বছা মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে প্রায় দেড় হাজার ইয়াহূদী বসতি স্থাপনকারী। ইয়াহূদীদের ধর্মীয় উৎসব 'সুক্কোত' উপলক্ষে আল-মাগারিবা ফটক দিয়ে তারা দলে দলে সেখানে অনুপ্রবেশ করে। মসজিদ চত্বরে ঢুকে তারা উস্কানিমূলকভাবে বিভিন্ন তালমুদীয় আচার ও প্রার্থনা সম্পন্ন করে। এ সময় ইসরাঈলি বাহিনী পুরো পুরোনো জেরুযালেম শহরে কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনী গড়ে তোলে। ফিলিস্তীনি ও মুসলিম মুছল্লীদের আল-আক্বছায় প্রবেশে ব্যাপক বাধা দেওয়া হয় এবং তাদের চলাচলের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ঐতিহাসিক 'স্ট্যাটাস ক্যু' বা আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী অমুসলিমদের আল-আক্বছায় প্রার্থনার নিয়ম নেই। ইসরাঈলিদের এই পদক্ষেপকে পবিত্র স্থানের আইনি অধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং ফিলিস্তীনিদের প্রতি সরাসরি উস্কানি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ফিলিস্তীনে চরম সংকট: তিন শরণার্থী শিবির এখন জনমানবহীন

জাতিসংঘের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন চিত্র থেকে পশ্চিম তীরের জেনিন, নূর শামস এবং তুলকারেম শরণার্থী শিবিরের এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। ইসরাঈলি বাহিনীর ধারাবাহিক সামরিক অভিযানের ফলে এই তিনটি ঐতিহাসিক শিবির থেকে ৩৩,০০০-এরও বেশি ফিলিস্তীনিকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমগুলোর তথ্য অনুযায়ী, বুলডোজার দিয়ে ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া, ড্রোন হামলা এবং পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে সেখানে এক অবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ জেনিনের ৫২% এবং নূর শামসের ৪৮% অবকাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সামাজিক মাধ্যমে অ্যাক্টিভিস্টদের পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে, শূন্য ও বিধ্বস্ত ক্যাম্পগুলো এখন ভূতুড়ে শহরে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ একে আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন এবং 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে আখ্যায়িত করে অবিলম্বে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

শাকসবজি থেকে ক্যানসার প্রতিরোধী সিরাপ বানালেন রাবি গবেষকরা

ক্যানসারের মতো মরণব্যাধির চিকিৎসায় এক যুগান্তকারী সফলতা অর্জন করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি)

ফার্মেসি বিভাগের একদল গবেষক। আমাদের প্রতিদিনের সহজলভ্য এবং চেনা খাদ্য উপাদানের নির্যাস ব্যবহার করে তাঁরা তৈরি করেছেন একটি অভিনব অ্যান্টিক্যানসার সাপ্লিমেন্ট সিরাপের প্রোটোটাইপ। 'Priceless Edible Foods: An Alternative Source of Expensive Anticancer Drugs' শীর্ষক দীর্ঘ ১০ বছরের এই গবেষণার আওতায় গবেষকরা মূলত লেবুর খোসা, টমেটো, ধনিয়া ও পালং শাকের নির্যাস নিয়ে কাজ করেন। প্রথম ধাপে গবেষণাগারে ৬৮টি দেশীয় উপাদান স্ক্রিনিং করে ক্যানসার কোষের বিরুদ্ধে এই ৪টি উপাদানের কার্যকারিতা সবচেয়ে শক্তিশালী পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ল্যাবরেটরিতে ক্যানসার আক্রান্ত ইঁদুরের ওপর (EAC mice model) এই উপাদানগুলোর সম্মিলিত নির্যাস প্রয়োগ করে টিউমারের বৃদ্ধি এবং ক্যানসার কোষের বিস্তার রোধে আশাব্যঞ্জক ও সফল ফল মিলেছে। প্রফেসর ড. এ এইচ এম খুরশীদ আলমের নেতৃত্বে এই গবেষক দলে ছিলেন প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, মো. আরিফুল ইসলাম এবং মো. রহমত আলী। সম্প্রতি ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় আয়োজিত বাংলাদেশ ইনোভেশন ফেয়ারে রাবির এই উদ্ভাবনটি প্রদর্শন ও সমাদৃত হয়। গবেষকদের লক্ষ্য, প্রাক-ক্লিনিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সফলভাবে সম্পন্ন করে দ্রুত এই সাশ্রয়ী সিরাপটি ক্যানসার রোগীদের জন্য বাজারে আনা।

দাওয়াত সংবাদ

শিক্ষা ও সমাজসেবায় নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ডেস্ক রিপোর্ট: শিক্ষা, গবেষণা ও আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (NIRF) এবং এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোর গত মাসের (সেপ্টেম্বর ২০২৬) শিক্ষা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম দেশজুড়ে ব্যাপক প্রশংসিত হচ্ছে। শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের পরিচালনায় পরিচালিত এই ফাউন্ডেশনের অধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উইংগুলো এ মাসে যুগান্তকারী কিছু সাফল্য অর্জন করেছে।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের গৌরবময় সাফল্য: গত ৪ সেপ্টেম্বর আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর জন্য সবচেয়ে বড় সুসংবাদ নিয়ে এসেছে প্রতিষ্ঠানটির কৃতী ছাত্ররা। সঊদী আরবের ঐতিহ্যবাহী মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (Islamic University of Madinah) উচ্চশিক্ষার জন্য এই জামি'আহ থেকে এবার রেকর্ডসংখ্যক ১৭ জন ছাত্র স্কলারশিপসহ ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েছেন। এর আগে জুলাই মাসেও মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শীর্ষস্থানীয় শায়খ এই জামি'আহ-এর রাজশাহী শাখায় এসে বিশেষ শিক্ষা সফর ও দারস প্রদান করে গেছেন। ছাত্রদের এই আন্তর্জাতিক স্তরের সাফল্য দেশের সালাফী শিক্ষা ধারায় এক অনন্য গৌরব যুক্ত করেছে।

দেশব্যাপী মক্তব অলিম্পিয়াড ও বইমেলা কার্যক্রম: ফাউন্ডেশনের দাওয়াতী উইং 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ'-এর তত্ত্বাবধানে দেশের মসজিদভিত্তিক মক্তবগুলোর মানোন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'মক্তব অলিম্পিয়াড ২০২৭ (সিজন-২)'-এর শুভ সূচনা হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর দিনাজপুরের বিরল সেন্টারে (তেঘরা শাখা) এর আঞ্চলিক অডিশন উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া ঢাকা আন্তর্জাতিক ইসলামী বইমেলায় 'মাকতাবাতুস সালাফ'-এর বিশেষ স্টল পরিদর্শন করেন আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহর পরিচালক ও মাসিক আল-ইতিছামের প্রধান সম্পাদক শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। সেখানে সাধারণ পাঠকদের মাঝে ফ্রি বই বিতরণ ও বিশেষ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসংস্থান ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ: নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন তাদের দাপ্তরিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করতে সেপ্টেম্বর মাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বার কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত 'Legal & Land Advisor' এবং 'Social Media Executive' পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ এডুকেশন সেন্টার (মিরপুর-১১ শাখা)-এর জন্য দক্ষ ভিডিও এডিটর, গ্রাফিক্স ডিজাইনার এবং আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ নারায়ণগঞ্জ বালিকা শাখার জন্য শিক্ষিকা ও বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। দ্বীনি শিক্ষার আধুনিকায়ন, তরুণ মেধার আন্তর্জাতিকায়ন এবং সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন বর্তমান সময়ে একটি আদর্শ ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের মেলে ধরেছে।

সওয়াল-জওয়াব

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): রাফেযী কারা? শুধু শীআদের কি রাফেযী বলা হয় নাকি সুন্নীরাও এদের অন্তর্ভুক্ত? তাদের মৌলিক আক্বীদাগুলো জানতে চাই।

-মোহাম্মদ শিমুল
ঢাকা।

উত্তর: শীআদের মধ্যে ২২টি দল রয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আক্বীদাসম্পন্ন হলো রাফেযী সম্প্রদায়। এদের আবির্ভাব হয়েছিল ইয়াহূদী নেতা আব্দুল্লাহ বিন সাবার মাধ্যমে। রাফেযী শব্দের অর্থ প্রত্যাখ্যানকারী। একদা একদল শীআ যায়েদ বিন আলী যায়নুল আবেদীন রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট এসে আবূ বকর ও উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে মুক্তি চাইল। তখন তিনি বললেন, তারা তো আমার দাদার (আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর) সহযোগী ছিলেন। তখন তারা বলল, তাহলে আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করলাম। জবাবে তিনি বললেন, তাহলে তোমরা প্রত্যাখ্যানকারী। সেই থেকে এই চরমপন্থী শীআদেরকে রাফেযী বা প্রত্যাখ্যানকারী বলা হয় *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৩৯০)*। এছাড়া আবূ বকর, উমার ও উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-এর খেলাফতকে প্রত্যাখ্যান করার কারণেও তাদেরকে রাফেযী বলা হয়ে থাকে (মিনহাজুস সুন্নাহ, লি-ইবনি তায়মিয়্যাহ, ১/৩৫, ২/৯৬, ৩/৪৭০)। রাফেযীদের মৌলিক আক্বীদাগুলো হচ্ছে- ১. ইমামত: আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু ও তার বংশধরদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট ১২ জন ইমাম এবং তাদের ইমামতকে দ্বীনের মৌলিক বিষয় মনে করা। ২. ইমামগণ ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ থেকে নিষ্পাপ। ৩. ইমামগণ অতীত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। ৪. তাকিয়্যাহ: ভয় বা ক্ষতির আশঙ্কায় নিজের প্রকৃত বিশ্বাস গোপন করা বৈধ। দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-আসকারী গায়বতে আছেন এবং শেষ যুগে প্রকাশিত হবেন (আল-কাফী, কিতাবুল হুজ্জাহ, ১ম খণ্ড, কিতাবুল-ঈমান ওয়াল-কুফর)।

প্রশ্ন (২): মুনাফিকরা কি ইসলাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে যায়? তারা কি কাফের? কারো বাহ্যিক কর্মকাণ্ড দেখে মুনাফিক বলা যাবে কি?

-খলিল
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

উত্তর: মুনাফিক দুই প্রকার- ১. আক্বীদাগত/বড় মুনাফিকী (النفاق الأكبر): অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখে বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করা। এ ধরনের ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কাফের এবং ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে' *(আন-নিসা, ৪/১৪৫)*। ২. আমলগত/ছোট মুনাফিকী (النفاق الأصغر): কোনো মুসলিমের মধ্যে মুনাফিকদের কোনো চরিত্র থাকা; যেমন- মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও আমানতের খেয়ানত করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি- কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৯)*। এ ধরনের মুনাফিকী ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, তবে তা মারাত্মক গুনাহ ও নিন্দনীয় চরিত্র। কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক কর্মকাণ্ড দেখে অন্তরের বিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান না থাকলে তাকে 'মুনাফিক' অর্থাৎ (অন্তরে কাফের) বলা যাবে না। কারণ অন্তরের বিষয় আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। তবে কারো মধ্যে মুনাফিকদের কোনো আমলগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেলে বলা যাবে, 'তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে'; কিন্তু এর মাধ্যমে তাকে কাফের বা ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুনাফিক ঘোষণা করা যাবে না।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৩): ফজরে যদি এমন সময়ে ওঠা হয় যে গোসল করার সময় নেই অর্থাৎ গোসলে করতে গেলে সূর্যোদয় শুরু হবে। অথচ সে রাতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছে। তাহলে তায়াম্মুম করে ছালাত পড়তে পারবে কি?

-মাহমুদ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: কেউ যদি ফজরের সময়ের শেষদিকে ঘুম থেকে উঠে জুনুবী অবস্থায় থাকে এবং গোসল করতে গেলে সূর্য উঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবুও সে গোসল করবে, এরপর ছালাত আদায় করবে, যদিও এর মধ্যে সূর্য উঠে যায়। আবূ কাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাদের ছালাতের সময় ঘুমিয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করলেন। তখন

তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে কোনো অবহেলা নেই। অবহেলা হলো জাগ্রত অবস্থায়। অতএব, তোমাদের কেউ যদি কোনো ছালাত ভুলে যায় অথবা ছালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে যখনই তার ছালাতের কথা স্মরণ হবে, তখনই সে তা আদায় করবে’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪৩৭; তিরমিযী, হা/১৭৭)*। তবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করেও ছালাত আদায় করতে পারে।

প্রশ্ন (৪): শুধু প্রস্রাব-পায়খানার জন্য ওয়াশরুমে গেলেই কি ‘আল্লাহুম্মা...খুবুছি ওয়াল খবাইছ’ এই দু‘আ পড়তে হবে নাকি গোসল করতে গেলে বা ব্রাশ করতে ওয়াশরুমে গেলেও এই দু‘আ পড়তে হবে?

-আশরাফুল আলম ইকো
ফুলদিঘী, বগুড়া সদর, বগুড়া।

উত্তর: শৌচাগারে প্রবেশের সময় দু‘আ পড়া সুন্নাত হওয়ার কারণ শয়তানদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা অর্জন করা। কেননা শয়তানরা আল্লাহ তাআলার যিকিরমুক্ত অপবিত্র ও মানুষের সতর উন্মুক্ত হওয়ার স্থানগুলোতে উপস্থিত হয়ে অনিষ্ট করার সুযোগ গ্রহণ করে। তাই একজন মুসলিমের প্রত্যেকবার পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে শৌচাগারে প্রবেশের সময় দু‘আ পড়বে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশকালে যেন বলে, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পুরুষ ও নারী অপবিত্র জিন শয়তান হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ *(আবূ দাঊদ, হা/৬)*। আর ওয়াশরুমে গোসল বা ব্রাশ করতে যাওয়ার জন্য দু‘আ পড়তে হবে না।

প্রশ্ন (৫): তেলাপোকার বিষ্ঠার কারণে যদি কুরআনের পৃষ্ঠায় সামান্য দাগ লাগে, তাহলে এতে কি কোনো পাপ হবে? নাকি কুরআনটি মাটিতে পুতে দেব?

-জাকারিয়া ইসলাম
পিরোজপুর।

উত্তর: কুরআনুল কারীমকে সর্বদা সম্মান করা এবং সংরক্ষিত স্থানে রাখা আবশ্যক। অনিচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের পাতায় তেলাপোকার বিষ্ঠা বা অন্য কোনো অপবিত্রতা সামান্য লাগলে এতে কোনো গুনাহ হবে না। তবে কুরআনের সম্মান রক্ষার্থে সম্ভব হলে অপবিত্রতা ও তার দাগ পরিষ্কার করে নিতে হবে। তবে যদি এমন কিছু লাগে যাতে কুরআন পাঠের অনুপযোগী হয়ে যায়, তাহলে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে তিনি কুরআনের লিখিত মুছহাফসমূহের এক একখানা মুছহাফ এক এক প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং এছাড়া আলাদা আলাদা বা একত্রিত কুরআনের যে কপিসমূহ রয়েছে তা জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৮৭; মিশকাত, হা/২২২১)*।

প্রশ্ন (৬): ওযূ করার সময় পায়ের আঙুলগুলো এমনিই ভালোভাবে ধৌত করলে হবে নাকি একটি একটি করে আঙুলের ফাঁকে হাতের আঙুল প্রবেশ করিয়ে খিলাল করতে হবে?

-মাসুদ রানা
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর: ওযূতে ধৈত করতে হয় এমন অঙ্গগুলোতে পানি পৌঁছালে ওযূ হয়ে যাবে। তবে ওযূতে পা ধৌত করার সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হলো, দুই পা টাখনুসহ ধৌত করার পাশাপাশি পায়ের আঙুলসমূহ খিলাল করা। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘পরিপূর্ণভাবে ওযূ করবে এবং আঙুলসমূহ খিলাল করবে’ *(আবূ দাঊদ, হা/১৪২)*। মুসতাওরিদ ইবনু শাদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওযূর সময় তাঁর কনিষ্ঠ আঙুল দ্বারা পায়ের আঙুলসমূহ খিলাল করতে দেখেছি *(আবূ দাঊদ, হা/১৪৮)*।

ছালাত

প্রশ্ন (৭): চার রাকআত বিশিষ্ট ছালাতে যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর ভুল করে দরূদ পড়ে ফেলি এবং সাথে সাথে যদি স্মরণে আসে, তাহলে কি ছালাত শেষে সাহু সিজদা দিতে হবে? কী কী ভুল হলে সাহু সিজদা দিতে হয়?

-মোহাম্মদ শিমুল
ঢাকা।

উত্তর: এমতাবস্থায় সাহু সিজদা লাগবে না। কেননা প্রথম তাশাহহুদে দরূদ পড়ার প্রমাণ রয়েছে। হাদীছে এসেছে, দুই রাকআতের পরে তোমরা বসে বলবে, ‘আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি...’, এরপর যে দু‘আ ইচ্ছা হয় তা পাঠ করবে’ *(নাসাঈ, হা/১১৬৩)*। সাহু সিজদা প্রধানত যেসব ক্ষেত্রে দিতে হয়- ১. ছালাতের কোনো ওয়াজিব (যেমন- প্রথম তাশাহহুদ) ভুলে বাদ পড়লে সাহু সিজদা দিতে হয় *(ছহীহ বুখারী, ৮২৯/১২৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭০)*। ২. ভুলে ছালাতে অতিরিক্ত রুকন বা রাকআত হয়ে গেলে, সাহু সিজদা দিতে হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/১২২৬)*। ৩. রাকআতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হলে শরীআত নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী রাকআত পূর্ণ করে সাহু সিজদা করতে হয় *(ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭১ ও ৫৭২)*।

প্রশ্ন (৮): আমাদের মসজিদের ইমাম বলেন, তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর মাযহাব অনুসারে ছালাত পড়ান। আমি ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায় করি। তিনি বলেছেন, এ কারণে তার পিছনে আমার ছালাত হবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এ কথাটি কি সঠিক?

-মেহেদী
কোরবানপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

www.al-itisam.com

উত্তর: কথাটি সঠিক নয়; বরং এমতাবস্থায় ছালাত হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তারা তোমাদের ছালাত আদায় করায়। সুতরাং যদি তারা ঠিকভাবে ছালাত আদায় করায়, তাহলে তোমাদের ও তাদের ছওয়াব হবে। আর যদি ভুল করে, তাহলে তোমাদের ছওয়াব হবে এবং এর দায় তাদের উপর বর্তাবে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৬৪৮)*।

প্রশ্ন (৯): ঈদের ছালাতে দ্বিতীয় রাকআতে ইমাম যদি পাঁচ তাকবীর দিতে ভুলে যায় তাহলে ছালাত হবে কি? এর জন্য দ্বিতীয় রাকআতে সাহু সিজদা দেওয়া হলে সেই ছালাত কি গ্রহণ হবে নাকি আবার পড়তে হবে?

-মাসুদ রানা
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর: ঈদের ছালাতে অতিরিক্ত যে তাকবীরগুলো পাঠ করা হয় তা সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। সুতরাং যদি ভুলবশত অতিরিক্ত তাকবীর পাঠ না করা হয়, তাহলে ছালাত আদায় হয়ে যাবে এবং সিজদায়ে সাহুর প্রয়োজন নেই *(আল-মাজমূ', ইমাম নববী, ০৪/১২৩)*।

প্রশ্ন (১০): আমার পিতা মৃত্যুর আগে ৫ দিন ICU/HDU-তে ছিলেন। শেষ ৪ দিন জ্ঞান ছিল, কিন্তু ছালাত আদায় করেছেন কি-না জানা নেই। যদি না পড়ে থাকেন, তাহলে কি কোনো কাফফারা বা অন্য কিছু আদায় করতে হবে?

-মো. আরাফাত হোসেন
কুল্যাগাছা, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তর: কোনো ব্যক্তি জ্ঞান থাকা অবস্থায় অসুস্থ হলেও সামর্থ্য অনুযায়ী দাঁড়িয়ে, না পারলে বসে, তাও না পারলে কাত হয়ে ছালাত আদায় করা ফরয *(ছহীহ বুখারী, হা/১১১৭)*। কিন্তু আইসিইউ-তে থাকার কারণে শেষের দিনগুলো ছালাত আদায় করেছেন কি-না তা জানা না গেলে বা ছালাত আদায় করেননি মর্মে নিশ্চিতভাবে জানা গেলেও, তার জন্য শরীআতে নির্ধারিত কোনো কাফফারা নেই। বরং তার সন্তানগণ তার জন্য দু'আ, ইস্তিগফার ও দান-ছাদাকা করতে পারেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১)*।

প্রশ্ন (১১): কোন কোন কারণে পুরুষদের ঘরে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে এবং তা আল্লাহর কাছে কবুল হবে?

-আসাদুজ্জামান
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: সাধারণ অবস্থায় পুরুষদের জন্য মসজিদে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনল এবং তার কোনো ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামাআতে উপস্থিত হলো না, তার ছালাত নাই' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৩; ইবনু মাজাহ, হা/৭৯৩)*। তবে ভীষণ অসুস্থতা, প্রাণ বা সম্পদের নিরাপত্তা, প্রচণ্ড বৃষ্টি, কাঁদাযুক্ত রাস্তা অথবা জলাবদ্ধতার কারণে মসজিদে উপস্থিত না হয়ে বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জামাআতে ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি কেউ ভয়ভীতি ও অসুস্থতার কারণে জামাআতে হাযির হতে অক্ষম হয়, তবে তার জন্য বাড়িতে ছালাত আদায় করা দূষণীয় নয়' *(ছহীহ বুখারী, হা/৯০১; আবূ দাঊদ, হা/৫৫১)*।

প্রশ্ন (১২): মসজিদের ভিতর মোবাইলে দ্বীনী আলোচনার ভিডিও অথবা অন্য ভালো কোনো ভিডিও দেখা যাবে কি? নাকি মসজিদে দেখলে পাপ হবে?

-সাজিদ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: মসজিদ নির্মাণ করা হয় জামাআতে ছালাত আদায়, খুৎবা শোনা, যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত এবং দ্বীনী আয়োজনে অংশগ্রহণ করার জন্য। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয়ই এই ছালাত, এতে মানুষের কোনো কথাবার্তা বলা বৈধ নয়; এটি তো কেবল তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তিলাওয়াত' *(আবূ দাঊদ, হা/৯৩০)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ 'খবরদার! তোমরা (মসজিদে) বাজারের মতো শোরগোল, ঝগড়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকো' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩২)*। অতএব, মসজিদে এসব কাজের বাইরে অন্য কোনো কাজ করা সমীচীন নয়। তবে দ্বীনী বক্তব্য হলে শালীনতা রক্ষা করে শুনতে পারে।

প্রশ্ন (১৩): জানাযার ছালাতে কীভাবে দাঁড়াব? পায়ের সাথে পা লাগাতে হবে কি?

-মুসতাকিম
ফেনী।

উত্তর: হ্যাঁ, জানাযার ছালাতে পায়ের সাথে পা মিল করেই দাঁড়াতে হবে। কারণ এটাও ছালাত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর জানাযায় সারিবদ্ধ হন এবং চার তাকবীরে জানাযা পড়ান *(ছহীহ বুখারী, হা/১২৪৫; মিশকাত, হা/১৬৫২)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, আমরা জনৈক ব্যক্তির জানাযায় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম *(ছহীহ বুখারী, হা/১৩২১; মিশকাত, হা/১৬৫৮)*।

যাকাত-দান-ছাদাকা

প্রশ্ন (১৪): বাবা-মায়ের দেওয়া হাতখরচ থেকে দান করলে ছওয়াব কার হবে—দানকারী সন্তানের, নাকি অর্থদাতা বাবা-মায়ের, নাকি উভয়ের?

-জাকারিয়া ইসলাম
পিরোজপুর।

উত্তর: বাবা-মায়ের দেওয়া হাতখরচ বা অর্থ থেকে সন্তান দান করলে সন্তান দানকারী হিসেবে পূর্ণ ছওয়াব পাবে। একইসঙ্গে বাবা-মাও অর্থ উপার্জন করে সন্তানকে দেওয়ার কারণে সমপরিমাণ ছওয়াবের অংশীদার হবেন। এতে কারও ছওয়াব অপরের কারণে সামান্যও কমবে না। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো স্ত্রী যদি তার ঘর হতে ক্ষতির উদ্দেশ্য ছাড়া খাদ্যদ্রব্য ছাদাকা করে, তবে এ জন্য সে ছওয়াব লাভ করবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও ছওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চিও অনুরূপ ছওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্য জনের ছওয়াবে কোনো কমতি হবে না' *(ছহীহ বুখারী, হা/১৪২৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১০২৪)*।

প্রশ্ন (১৫): বিভিন্ন ফাউন্ডেশন কিংবা ব্যক্তিরা মানুষের কাছ থেকে যাকাত কালেক্ট করে বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন, কিংবা মানুষকে আর্থিক সহযোগিতা করেন, আবার কেউ কেউ স্বাবলম্বী প্রকল্পও পরিচালনা করেন। এই ক্ষেত্রে যদি আমার যাকাতের টাকা তাদের কাছে দেই এবং তারা যদি যাকাতের প্রাপ্য হক্বদারের কাছে বিতরণ না করেন, তাহলে আমার যাকাত আদায় হবে কি?

-রাজু আহমেদ
কুমিল্লা।

উত্তর: কোনো ব্যক্তি বা ফাউন্ডেশন যদি যাকাত বিতরণের প্রতিনিধি (وَكِيل) হিসেবে যাকাত সংগ্রহ করে, তাহলে তাদের দায়িত্ব শরীআত নির্ধারিত খাতসমূহে যাকাতের সম্পদ যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া। তারা যদি যাকাতের অর্থ নির্ধারিত হক্বদারদের কাছে না দিয়ে অন্য কোনো অননুমোদিত খাতে ব্যয় করে, তাহলে শুধু তাদের কাছে যাকাতের অর্থ হস্তান্তর করার মাধ্যমে যাকাত আদায় হবে না। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকাত ব্যয়ের খাত নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ছাদাকা (যাকাত) তো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(আত-তাওবা, ৯/৬০)*।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (১৬): গ্রামে ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি ছেড়ে দিয়ে পালন করার কারণে অনেক সময় অনেকের ফসল নষ্ট হয়। ফসল বা ক্ষতির বিনিময়ে ছাগল ধরে খেয়ে ফেললে গুনাহ হবে কি? অন্যের ক্ষতি করে এভাবে গবাদিপশু পালন করা যাবে কি?

-তোফায়েল আমিন
গাইবান্ধা।

উত্তর: পশু যদি দিনের বেলায় শস্য খেয়ে নেয়, তাহলে এতে জমির মালিক দায়ী। আর যদি রাতের বেলা শস্য খেয়ে নেয়, তাহলে পশুর মালিক দায়ী। বারা ইবনু আযেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (নিম্নরূপ) ফায়সালা প্রদান করেছিলেন, 'বাগ-বাগিচার দেখাশোনার দায়িত্ব দিনের বেলা তার মালিকের উপর (দিনের বেলা লোকসানের জন্য মালিক দায়ী থাকবে)। গৃহপালিত জন্তুর রাতের বেলায় দেখাশোনার দায়িত্ব তার মালিকের উপর ন্যস্ত। রাতের বেলায় গৃহপালিত পশুর ক্ষতির জন্য পশুর মালিক দায়ী থাকবে' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৬৯; ইবনু মাজাহ, হা/২৩৩২)*। তবে বর্তমান সামাজিক অবস্থায় গবাদিপশু অনেক ক্ষতি করে। কাজেই পশুর মালিককে দিনের বেলাও তার পশু নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আর ক্ষতির কারণে মালিকের অনুমতি ছাড়া তার পশু ধরে জবাই করে খাওয়া বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'ইসলামে নিজের ক্ষতি করাও নিষিদ্ধ, অন্যের ক্ষতি করাও নিষিদ্ধ' *(ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪১)*। অতএব, ফসলের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি পশুর মালিকের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে অথবা প্রয়োজনে বৈধ বিচারিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে; নিজের হাতে প্রতিশোধ নেওয়া বা পশু জবাই করে নেওয়া বৈধ নয়।

প্রশ্ন (১৭): ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যাবে কি? এতে সূদের সাথে জড়িত অনেক বিষয় ও কেনাকাটায় বিভিন্ন অফার থাকে। বিদেশ ভ্রমণেও অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

-আকরাম
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তর: স্বাভাবিকভাবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা এতে ঋণ ও বিলম্বিত পরিশোধের ক্ষেত্রে সূদ নেওয়ার শর্ত রয়েছে, যা থেকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দূরে থাকতে বলেছেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ছালাতে সর্বদাই ঋণ থেকে আশ্রয় চাইতেন *(নাসাঈ, হা/৫৪৮৭)*। জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন সূদখোরের উপর, সূদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও তার সাক্ষী দুজনের উপর এবং বলেছেন,

www.al-itisam.com

‘এরা সবাই সমান’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)*। আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন *(আল-বাকারা, ২/২৭৫)*। তবে নিরুপায় হয়ে গ্রহণ করা ভিন্ন বিষয়।

প্রশ্ন (১৮): আমি অনলাইনে ব্যবসা করি এবং ফেসবুকে পণ্যের ভিডিও আপলোড করি। যদি এসব ভিডিওতে কোনো বাদ্যযন্ত্র বা মিউজিক ব্যবহার না করে শুধু মানুষের কণ্ঠে গাওয়া ভোকাল সাউন্ড ব্যবহার করি, যার কথায় কোনো অশ্লীলতা বা হারাম বিষয় নেই এবং ভিডিওও শরীআতসম্মত হয়, তাহলে তা ব্যবহার করা কি জায়েয? যদি জায়েয না হয়, তাহলে এর বিকল্প কী হতে পারে?

-রুপাক্ষী
রাজশাহী।

উত্তর: ভিডিওতে যদি কোনো মিউজিক/বাদ্যযন্ত্র না থাকে, কথায় অশ্লীলতা, শিরক, হারাম বা অনৈতিক বিষয় না থাকে, পুরুষের স্বাভাবিক কণ্ঠ হয়, নারীর কণ্ঠ না হয়, কণ্ঠকে এমনভাবে পরিবেশন করা না হয় যা অশ্লীল গান বা ফিতনার দিকে নিয়ে যায় এবং ভিডিওর দৃশ্যও শরীআতসম্মত হয়, তাহলে এ ধরনের ভোকাল ব্যবহার করা যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, ঈদের দিন তার কাছে দুই আনছারী কিশোরী ছিল, তারা বুআসের যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে গান করছিল। আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আপত্তি করলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘তাদের ছেড়ে দাও’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৯৫০)*।

প্রশ্ন (১৯): AI কোনো মানুষের চরিত্র দিয়ে ফেসবুক বা ইউটিউবে কুরআনের আয়াত, হাদীছ, দু‘আ ও যিকির শেখানো এবং তা থেকে আয় করা কি জায়েয?

-নাফিউন হক
কুমিল্লা।

উত্তর: AI-এ কোনো মানুষের চরিত্র ব্যবহার করে কুরআন, হাদীছ, দু‘আ ও যিকির শেখানো যাবে না। কেননা তাতে মিথ্যা আরোপ, প্রতারণা, চেহারা ও কণ্ঠের বিকৃতি, আয়াত ও হাদীছের মূল ইবারতে, অনুবাদে, সূত্রে, মাসআলায় ভুলের সম্ভাবনা, চরিত্রের অতিরিক্ত অভিনয়, হাস্যরস, নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি, আকর্ষণীয় মুখভঙ্গি বা বিনোদনমূলক উপস্থাপনা, দ্বীনের নামে বাণিজ্যিক আকর্ষণ (যেমন- ভিউ, সাবস্ক্রিপশন, বিজ্ঞাপন বা আয় বাড়ানোর জন্য কুরআন-হাদীছকে অতিরিক্ত ক্লিকবেইট, নাটকীয়তা ও চমকপ্রদ উপস্থাপনা), কণ্ঠ/চেহারার অপব্যবহার করা হয়, যেগুলো ইসলামী শরীআতে হারাম। সুতরাং সেখান থেকে আয় করাও জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর—এসবের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে’ *(আল-ইসরা, ১৭/৩৬)*।

প্রশ্ন (২০): সরকারি রাস্তা বা ফুটপাতের জায়গায় স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদনের ভিত্তিতে দোকান/অস্থায়ী ভ্যান বসিয়ে ব্যবসা করা কি জায়েয হবে? যদি জায়েয না হয়, তাহলে এটা কোন ধরণের গুনাহ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: সাধারণত সরকারি রাস্তা বা ফুটপাত জনসাধারণের চলাচলের জন্য নির্ধারিত। যদি সেখানে দোকান বা অস্থায়ী ভ্যান বসানোর কারণে জনসাধারণের চলাচলে অসুবিধা হয় এবং তাদের কষ্ট হয়, তাহলে তা জায়েয নয়। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি বৈধভাবে নির্দিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্থায়ী দোকান বা ভ্যান বসানোর অনুমতি দেয় এবং এতে মানুষের চলাচলে ক্ষতি না হয়, তাহলে সেই অনুমতির সীমার মধ্যে ব্যবসা করা জায়েয *(ছহীহ বুখারী, হা/২৪৬৫)*। অনথ্যায় জায়েয নয়।

প্রশ্ন (২১): বাইনান্সে Spot Trade করা যাবে কি? কেউ আবার স্পট ট্রেডকে স্টক ব্যবসার মতো মনে করে কাজ করছে।

-আব্দুর রাকিব
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: বাইনান্স একটি অনলাইন বাজার, যেখানে বিটকয়েন (Bitcoin), ইথারেয়াম (Ethereum) এবং বাইনান্স কয়েনের (BNB) মতো শত শত ভার্চুয়াল মুদ্রা কেনা, বিক্রি ও বিনিময় করা যায়। এই বাইনান্সে স্পট ট্রেড (সরাসরি ডিজিটাল মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়) করা জায়েয নয়। কারণ এই ডিজিটাল মুদ্রাগুলো শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে মাল বা সম্পদ নয়, আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে এগুলো স্বীকৃত মুদ্রাও নয়। সুতরাং যারা স্পট ট্রেডকে স্টক বিজনেসের মতো মনে করছে তারা ভ্রান্তির শিকার। কারণ স্টক বিজনেসের জন্য পণ্যটি শরীআত স্বীকৃত সম্পদ হতে হবে। আর ডিজিটাল মুদ্রা শরীআত স্বীকৃত সম্পদ নয়। কারণ শরীআত স্বীকৃত সম্পদ হওয়ার জন্য অন্তত তিনটি শর্তে উত্তীর্ণ হতে হয়- ১. ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে এমন সম্পদ হতে হবে, যার মূল্য নির্ধারণ করা যায়। ২. মালিকানা বৈধ উপায়ে হস্তান্তর করা যায়। ৩. منفعة مباحة অর্থাৎ তার দ্বারা বৈধভাবে উপকৃত হওয়া যায় *(ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ৪/২৫১)*। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য একত্রে বিদ্যমান থাকে না ডিজিটাল মুদ্রার মধ্যে। তাই এটা সম্পদ নয়। আবার বাংলাদেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা বাইনান্সের সরাসরি আইনি বৈধতা নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের পক্ষ থেকে ক্রিপ্টো লেনদেনের বিষয়ে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন বা ব্যাংক থেকে সরাসরি টাকা তোলা ঝুঁকিপূর্ণ ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব, বাইনান্সে স্পট ট্রেডসহ যাবতীয় লেনদেন জায়েয নয়।

প্রশ্ন (২২): আমার নাম মো. আলমগীর হোসেন। ইতিছাম ফাতওয়া বোর্ড থেকে আমার নাম পরিবর্তন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এনআইডি, মাস্টার্স পর্যন্ত সকল সার্টেফিকেট, ছেলের জন্ম নিবন্ধনসহ অনেক কাগজে পরিবর্তন করা অত্যন্ত জটিল। তাই কাগজে পরিবর্তন না করে মৌখিকভাবে 'হোসাইন বিন আব্দুল আউয়াল' নাম রাখা যাবে কি? এর জন্য কি পুনরায় আকীকা করতে হবে?

-মো. আলমগীর হোসেন
চারাবাগ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

উত্তর: কাগজপত্রে নাম পরিবর্তন বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হওয়ার কারণে কাগজপত্রে তা ঠিক রেখে শুধু মৌখিক ও সামাজিকভাবে 'হোসাইন বিন আব্দুল আউয়াল' নামে পরিচিত হওয়া যায়। আর এর জন্য পুনরায় আকীকা করতে হবে না। নবী ﷺ এক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?' তিনি বললেন, হাযন (কঠিন)। নবী ﷺ বললেন, 'তুমি সাহল (সহজ)' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬১৯০)*। আকীকা শিশু জন্মগ্রহণের সপ্তম দিনে করতে হয়। কেননা রাসূল ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করতে হয়' *(আবূ দাঊদ, হা/২৮৩৮)*।

প্রশ্ন (২৩): আমাদের গ্রামে ঈদের দিন খেলাধুলার আয়োজন করা হয় এবং গ্রামবাসীর কাছ থেকে টাকা তুলে পুরস্কার দেওয়া হয়। এ রকম আয়োজন করা যাবে কি?

-মুহাইমিনুল ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর: বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে ঈদ উপলক্ষ্যে যেসব খেলাধুলার আয়োজন দেখা যায় তা একাধিক কারণে জায়েয নয়। যেমন- ১. খেলাগুলো শরীআতসম্মত হয় না। ২. উচ্চ আওয়াজে গান বাজানো হয় ও প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়া হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৬)*। ৩. নারী-পুরুষের অবাধ অংশগ্রহণ থাকে *(আন-নূর, ২৪/৩০-৩১)*। ৪. চাপ সৃষ্টি করে টাকা উত্তোলন করা হয়। তবে ঈদের দিন বৈধ উপায়ে কাউকে কষ্ট না দিয়ে হালাল খেলাধুলা আয়োজন করার সুযোগ রয়েছে। টাকা উঠিয়ে যদি হারজিতের পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহলে তা জুয়া হবে এবং খেলায় অংশগ্রহণকারীদের টাকা দিয়ে পুরস্কার দেওয়া যাবে না। তৃতীয় পক্ষ বা স্পন্সর নিয়ে পুরস্কার দিলে সমস্যা নেই *(আল-মায়েদা, ৫/৯০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৬৯৫)*।

প্রশ্ন (২৪): বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে আইনজীবী হওয়া কি ইসলামসম্মত? আমার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আইনি হয়রানি থেকে রক্ষা করা। তবে দেশের বিচারব্যবস্থায় ইসলামী শরীআহ চালু নেই, প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এ অবস্থায় আইনজীবী পেশা গ্রহণ করা কি জায়েয?

-নাঈম
কুমিল্লা।

উত্তর: ইসলামী শরীআতকে পাশ কাটিয়ে মানব রচিত আইন এর উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে আইনজীবী হওয়া মূলত জায়েয নয়, কেননা তা দ্বীনের একটি মৌলিক নীতিকে ধ্বংস করে দেয়। আর তা হলো, আল্লাহ তাআলার চেয়ে উত্তম বিধানদাতা বা বিচারক আর কেউ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই' *(ইউসুফ, ১২/৪০)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'অতএব, তাদের জন্য ধ্বংস, তাদের হাত যা লিখেছে তার কারণে এবং তাদের জন্য ধ্বংস, তারা যা উপার্জন করে তার কারণে' *(আল-বাক্বারা, ২/৭৯)*। তবে মানুষের অধিকার আদায়, প্রয়োজন-নির্ভরতা, ক্ষতি ও অনিষ্ট কমানো এবং মুসলিমদের ওপর থেকে যুলম দূর করার ক্ষেত্রে জরুরী প্রয়োজন ও প্রয়োজনীয়তার শারঈ নীতিমালা বিবেচনা করে কিছু শর্তসাপেক্ষে আইনজীবী হওয়া এবং এ ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। শর্তগুলো হলো- ১. সে এসব আইন এবং এসব আইনের প্রণেতাদের থেকে এবং জরুরী প্রয়োজন ছাড়া এসব আইনের অধীনে বিচার গ্রহণ করা থেকে আল্লাহর কাছে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করবে। ২. এমন কোনো মামলায় সে ওকালতি করবে না, যেখানে রায় আল্লাহর বিধানের বিরোধী ও পরিপন্থী হবে, যেমন- ব্যভিচারী, চোর, সূদখোর ইত্যাদির পক্ষে এমনভাবে মামলা পরিচালনা করা যাবে না, যাতে তাদের অন্যায়কে সমর্থন করা হয়। ৩. তার ওকালতির উদ্দেশ্য হতে হবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, অন্যায় প্রতিহত করা অথবা মাযলূমকে সাহায্য করা। যদি সে দেখতে পায় যে, তার মক্কেলের পক্ষেই সত্য ও ন্যায় রয়েছে, তাহলে সে তার পক্ষে দাঁড়াবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করবে। ৪. এসব প্রচলিত আদালতের মাধ্যম ছাড়া অধিকার আদায় বা যুলম প্রতিহত করার অন্য কোনো উপায় না থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী বিচার করে না, তারা কাফের' *(আল-মায়েদা, ৫/৪৪)*।

প্রশ্ন (২৫): আমার বাচ্চার বয়স ৭ বছর। সে প্রচুর মোবাইলে আসক্ত। পড়াশুনায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলছে। আগে কুরআন পড়ত, এখন তাও পড়ে না। আমার করণীয় কী? প্রহার করা ঠিক হবে কি?

-আশিক
ঢাকা।

www.al-itisam.com

উত্তর: ৭ বছরের শিশুকে মোবাইলের আসক্তির কারণে প্রহার করা উচিত নয়। ধৈর্য, নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও ভালোবাসার মাধ্যমে তার অভ্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা করাই উত্তম। বিশেষ করে কুরআন পড়া ও পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ফিরিয়ে আনতে নিচের পদক্ষেপ গুলো নেওয়া উচিত- ১. মোবাইল বাচ্চার নাগালের (দৃষ্টির) বাইরে রাখুন। ২. মোবাইলের বিকল্প দিন; খেলাধুলা, গল্পের বই, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো ও সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করুন। ৩. কুরআনের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করুন। চাপ না দিয়ে প্রতিদিন ৫–১০ মিনিট দিয়ে শুরু করুন এবং অল্প পড়লেও প্রশংসা করুন। বাবা-মা নিজেরাও সামনে কুরআন পড়ুন। ৪. কুরআনকে মোবাইলের পুরস্কারে পরিণত করবেন না। 'কুরআন পড়লে মোবাইল দেব'—এভাবে না বলে কুরআনের প্রতি আলাদা ভালোবাসা ও আনন্দ তৈরি করুন। ৫. ঘুমের আগে মোবাইল বন্ধ রাখুন। সম্ভব হলে মোবাইল/ট্যাব শোবার ঘরের বাইরে রাখুন।

প্রশ্ন (২৬): কোনো ব্যক্তি আমার অনেক ক্ষতি করলে এবং কষ্ট দিলে তার মৃত্যু, দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো ক্ষতির জন্য বদদু'আ করা কি জায়েয? ইসলামের দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রে সঠিক করণীয় কী?

-মো. লোবাব ইসলাম
নাকাই হাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর: কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা কষ্ট পেলে তার বিরুদ্ধে লা'নত করা বা বদদু'আ করা রাসূল ﷺ-এর আদর্শ নয় এবং প্রকৃত মুমিন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যও নয়। রাসূল ﷺ বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি লা'নতকারী বা বদদু'আকারী হতে পারে না' *(তিরমিযী, হা/১৯৭৭)*। অপর হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন, 'নিশ্চয় আমি প্রেরিত হইনি লা'নতকারী হিসেবে; বরং আমি প্রেরিত হয়েছি রহমত হিসেবে' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৯৯)*। কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা কষ্ট পেলে করণীয় হলো ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্ষমা করে দেওয়া। কারণ আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন *(আল-বাকারা, ২/১৫৩)*। আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 'নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত ছওয়াব প্রদান করা হবে' *(আয-যুমার, ৩৯/১০)*।

প্রশ্ন (২৭): অমুসলিমরা কি মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে? যদি এটা জায়েয হয়, তাহলে অমুসলিমরা হারামাইনে কেন প্রবেশ করতে পারবে না? আর অমুসলিমরা কি কুরআন স্পর্শ করতে পারবে?

-আব্দুল হাই
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর: পৃথিবীর সব মসজিদে অমুসলিমরা প্রবেশ করতে পারলেও হারামাইনে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা হারামাইনের বিষয়টি স্বতন্ত্র। দাজ্জালের বিষয়টিও স্বতন্ত্র। সেও হারামাইনে প্রবেশ করতে পারবে না *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৮১)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং তারা যেন এই বছরের পর থেকে মাসজিদে হারামের নিকটেও না আসে' *(আত-তাওবা, ৯/২৮)*। উল্লেখ্য, হারামাইন (দুই হারাম) বলতে হারামে মাক্কী এবং হারামে মাদানীকে বুঝানো হয়। মক্কার মসজিদে হারামসহ তার পার্শ্ববর্তী নির্দিষ্ট কিছু এলাকাকে হারামে মাক্কীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর মদীনার মসজিদে নববীসহ তার পার্শ্ববর্তী নির্দিষ্ট কিছু এলাকাকে হারামে মাদানীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৩০৫৩; ফাতহুল বারী, ৬/১৭১)*। তবে অমুসলিম ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। কেননা রাসূল ﷺ মসজিদে অবস্থানকালীন তাঁর নিকট ওয়াফদে নাজরান, ওয়াফদে ছাক্বীফ ইত্যাদি বিধর্মী প্রতিনিধি দল ও ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়েছে, এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনুরূপভাবে সুমামা ইবনু উছাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) মসজিদের খুটিতে বেঁধে রাখা হয়েছিল *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৬৪)*। অমুসলিম ব্যক্তি কুরআনুল কারীম স্পর্শ করতে পারবে না *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৬৯; আল মাজমূ', ইমাম নববী, ২/৭১)*। তবে সে সত্য জানার জন্য কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও তাফসীরগ্রন্থ স্পর্শ এবং অধ্যয়ন করতে পারবে।

প্রশ্ন (২৮): আপেল শক্ত, বেদানার রক্ত, মিষ্টির ঝোল, গপাগপ তোল। চিড়িয়াখানার মেয়েরা হাফপ্যান্ট পরে, ছেলেদের দেখলে ডানচোখ মারে। ও ভাবি পিঠা কুড়াতে যাবি, পিঠা নিল চোরে, বর আসল ঘরে, বরের নাম জাব্বার, আল্লাহু আকবার। এলাকার শিশুরা এই ছন্দ বলে খেলাধুলা করে। এটা কি জায়েয?

-নাহিদ আলী
সরদহ, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: উক্ত ছন্দ বলে খেলাধুলা করা হারাম। কারণ এতে শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে- ১. আল্লাহর নাম নিয়ে উপহাস। জাব্বার আল্লাহর একটি নাম। আল্লাহর নাম নিয়ে উপহাস করলে ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়। ২. 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর নিয়ে উপহাস। তাকবীর বলার বিশেষ ক্ষেত্র রয়েছে। যেখানে সেখানে তাকবীর বলা যায় না। আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ সম্মান ও গাম্ভীর্য বজায় রেখে তাকবীর পাঠ করতে হয়। অতএব, এটাকে খেলাধুলার ছন্দে অন্তর্ভুক্ত করা

জায়েয নয়। ৩. মেয়েদের হাফপ্যান্ট পরা। এটা ইসলামের পর্দা ও হিজাব সংশ্লিষ্ট বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। ৪. মেয়েদের ডানচোখ মারা। এটা মূলত নারীদের শালীনতা ও লাজলজ্জা বিরোধী বাক্য। এরকম অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা কখনোই জায়েয হতে পারে না। ৫. দেবর-ভাবি সম্পর্ককে রসালোভাবে উপস্থাপন করা। এতে পর্দার বিধানকে উপেক্ষা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শিশুদের খেলাধুলার প্রয়োজন আছে বলে এসব অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ ছন্দ তাদের শূন্য মস্তিষ্কে গেঁথে দেওয়া ইসলামবিরোধী ব্যক্তিদের চক্রান্ত। এসব যেকোনোভাবে প্রতিহত করতে হবে। সুতরাং শিশুদের জন্য শরীআতসম্মত, শালীন, রুচিসম্মত ও শিক্ষামূলক ছন্দ রচনা করে তাদেরকে মুখস্থ করাতে হবে।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (২৯): আমি একটি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে কাজ করি। কাজের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের পোশাক, কখনো শালীনতার পরিপন্থী পোশাকও ডিজাইন করতে হয় এবং থ্রিডিতে মানুষের অবয়বে (Dummy) কাপড়গুলো পরিয়ে চেক করি। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে অর্জিত বেতন শরীআতের দৃষ্টিতে হালাল হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আনাম
সাভার, ঢাকা।

উত্তর: গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে কাজ করা থেকে বেঁচে থাকা ভালো। কেননা ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে অশালীন ডিজাইন, অঙ্গ বুঝা যায় এমন পাতলা বা টাইট পোশাক ডিজাইন করা এবং শরীআতবিরোধী কাজে যুক্ত হতে হয়। এর মাধ্যমে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হয়, যা থেকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ‘আর তোমরা গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না’ *(আল-মায়েদা, ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩০): কসাইখানার ব্যবসা করা যাবে কি? আর ব্যবসা হালাল হওয়ার জন্য কী কী শর্ত মানতে হবে?

-মো. রুহুল আমিন
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: কসাইখানার ব্যবসা (পশু ক্রয় করে জবাই করার পর তার গোশত বিক্রি করা) মৌলিকভাবে জায়েয। তবে এক্ষেত্রে কিছু শর্তাবলি রয়েছে-

১. পশু হালাল হতে হবে। যেমন- উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি *(আল-মায়েদা, ৫/১)*।

২. আল্লাহর নামে (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে) জবাই করতে হবে *(আল-আনআম, ৬/১২১)*।

৩. রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতী পদ্ধতিতে পশু যবেহ করতে হবে। যেমন- ছুরি ধার দিয়ে নেওয়া, যবেহের পর ছুরি দিয়ে শ্বাসনালি, কণ্ঠনালিতে আঘাত না করা, পশু পুরোপুরি নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া ছড়ানো বা পা কাটা যাবে না *(তিরমিযী, হা/১৪০৯; ইবনু মাজাহ, হা/৩১৭০)*।

৪. মৃত পশুর (জবাই ব্যতীত অন্য কোনোভাবে মারা যাওয়া পশু) গোশত বিক্রি করা যাবে না *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*।

৫. যেসব পশুকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, সেসব পশুকে জবাই করে তার গোশত বিক্রি করা যাবে না, কারণ এগুলোর গোশত খাওয়া হালাল নয় *(আল-মায়েদা, ৫/৩)*।

৬. ব্যবসার সাধারণ শর্ত পালন করতে হবে। যেমন- ওযনে কম না দেওয়া, মিথ্যা না বলা বা মিথ্যা কসম না করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৩১): আমি সেনাবাহিনীতে চাকরি করি। সামনে আসছে ঈদে মীলাদুন্নবী। সেই দিন সরকারি ছুটি। সেই দিনে বড় খানার আয়োজন করা হয়। প্রশ্ন হলো, সেই খাবার কি আমার জন্য হালাল?

-মো. হামিদুল ইসলাম রুপম
হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট।

উত্তর: ইসলামে বাৎসরিক ঈদ মাত্র দুইটি তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদ হলো ইবাদত। সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নাবী নামে নতুন ঈদ আবিষ্কার করা মানে নতুন ইবাদত আবিষ্কার করা, যা নিকৃষ্ট বিদআত। রাসূল ﷺ বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». ‘তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকো; কারণ (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বিষয় হলো বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআত হলো ভ্রষ্টতা’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭)*। অন্য হাদীছে এসেছে, وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ‘আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; নাসাঈ, হা/১৫৭৮)*। অপর হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে (বিদআত চালু করবে), তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৬৭)*।

রাসূল ﷺ বলেন, وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ‘যে বিদআত করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা, মানুষ এবং সকলের লা‘নত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোনো ফরয আমল এবং কোনো নফল কবুল করবেন না’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৫৫)*। সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নাবীর নামে প্রচলিত এই নিকৃষ্ট বিদআত সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠান ও খাবার বর্জন করতে হবে। কারণ এমন খাবারে বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা মানে উক্ত বিদআতকে সমর্থন করা, যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। বরং এসব আয়োজন প্রত্যাখ্যান করার ফায়েদা আছে, তা হলো, মানুষ এই বিদআত সম্পর্কে জানবে এবং আগামীতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

পারিবারিক বিষয়

প্রশ্ন (৩২): আমার বিয়ে পারিবারিকভাবে ২ বছর আগে মসজিদে হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, মসজিদে অনেক লোক উপস্থিত ছিল; তবে আলাদা করে কোনো সাক্ষী নির্ধারণ করা হয়নি। এ অবস্থায় আমার বিয়ে শরীআত অনুযায়ী ছহীহ ও সম্পূর্ণ হয়েছে কি-না?

-মাহাবুব
দিনাজপুর।

উত্তর: বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য দুজন মুসলিম সাক্ষী লাগবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘অভিভাবক ও দুজন ন্যায়পরায়ণ (আদল) সাক্ষী ছাড়া বিবাহ নেই’ *(ছহীহুল জামে’, হা/৭৫৫৭)*। তবে যেহেতু উক্ত বিবাহের সময় অনেক লোক উপস্থিত ছিল, সুতরাং বিবাহ ছহীহ হয়েছে।

প্রশ্ন (৩৩): কোনো বিধবা মহিলা কি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে পারবে?

-কামরুল
পাবনা।

উত্তর: কুমারী হোক কিংবা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হোক কোনো নারীর জন্য পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করা বৈধ নয়। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যেকোনো নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে, তার বিবাহ বাতিল! তার বিবাহ বাতিল! তার বিবাহ বাতিল!’ *(তিরমিযী, হা/১১০২; মিশকাত, হা/৩১৩১)*।

প্রশ্ন (৩৪): অনেক ইমাম, মুহাদ্দিছদের ব্যাপারে শুনেছি তারা বিবাহ করেননি। কোনো কারণবশত আমিও যদি এমন থাকতে চাই, তাহলে ইসলামে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-হানযালা
লালমনিরহাট।

উত্তর: ক. বিবাহ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং রাসূল ﷺ-এর আদর্শ। একজন মুসলিমের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, রাসূল ﷺ-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করা। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনজন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসল। যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবী ﷺ-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ তাঁর আগের ও পরের সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য হতে একজন বলল, আমি আজীবন রাতভর ছালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সবসময় ছিয়াম পালন করব এবং কখনো বাদ দেব না। অন্য একজন বলল, আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, ‘তোমরা কি ওই সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি ছিয়াম পালন করি, আবার কখনো তা থেকে বিরতও থাকি। আমি (রাতে) ছালাত আদায় করি এবং ঘুমাই। আমি নারীদের বিবাহ করি। সুতরাং যারা আমার আদর্শকে উপেক্ষা করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৩)*।

এছাড়াও বিবাহের দ্বীনী এবং দুনিয়াবী উপকারিতা রয়েছে।

প্রথমত, দ্বীনী উপকারিতা- ১. তাওহীদপন্থী জনবল বৃদ্ধি করা। সারা পৃথিবীতে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছানো এবং আল্লাহর কালিমা সুউচ্চ করার লক্ষ্যে তাওহীদপন্থী জনবল বৃদ্ধি করা অতীব প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে বিবাহই একমাত্র মাধ্যম। এজন্য রাসূল ﷺ প্রেমময় ও অধিক পরিমাণ সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তিনি এই উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করতে পারেন *(আবূ দাঊদ, হা/২০৫০)*।

২. দৃষ্টি হেফাযত করা *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৫)*।

৩. লজ্জাস্থান হেফাযত করা *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৫)*।

৪. হালাল পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে বিশেষ ছওয়াব অর্জন *(ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৬)*।

দ্বিতীয়ত, দুনিয়াবী উপকারিতা-

১. মানসিক প্রশান্তি লাভ *(আর-রূম, ৩০/২১)*।

২. অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জন *(আন-নূর, ২৪/৩২)*।

৩. নারীর জন্য উত্তম অভিভাবক নির্ধারণ *(আন-নিসা, ৪/৩৪)*।

৪. পুরুষের জন্য বাড়ি ও বাড়ির সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা *(আন-নিসা, ৪/৩৪)*।

৫. পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের স্বাদ আস্বাদন।

৬. বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৭. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সন্তানদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করা।

খ. যেসকল ইমাম ও মুহাদ্দিছগণ বিয়ে করেননি, তাদের কেউ অন্যদেরকে বিয়ে করতে অনুৎসাহিত করেননি। বরং বিবাহ যে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং রাসূল ﷺ-এর আদর্শ এ ব্যাপারে তাদের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। সুতরাং তাদের এই বক্তব্য অনুসরণীয়; তাদের কর্ম অনুসরণীয় নয়। কেননা তাদের বিয়ে না করার মূল কারণ সম্পর্কে আমরা অবগত নই। কিন্তু বর্তমানে বিবাহ ছাড়া ফিতনামুক্ত থাকার নিশ্চয়তা নেই; বরং ফিতনাগ্রস্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তাই বিবাহ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৫): আমাদের আগে দুইটা তালাক হয়ে গেছে। এর মধ্যে একদিন স্বামী রেগে বললেন, 'বাপের বাড়ি গেলে চিরজীবনের জন্য যাবে। আমার অনুমতি ছাড়া গেলে চিরজীবনের জন্য যাবে'। স্বামীর মনে তালাকের নিয়্যত ছিল কি-না সে নিশ্চিত নয়। এখন বাপের বাড়ি গেলে তালাক পতিত হবে কি?

-নুর জাহান
ঢাকা।

উত্তর: তালাকের জন্য 'তালাক' শব্দ ব্যবহার করেই তালাক দিতে হবে। অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না *(আত-তালাক, ৬৫/১)*। সুতরাং স্বামীর স্ত্রীকে বলা 'বাপের বাড়ি গেলে চিরজীবনের জন্য যাবে' এবং স্ত্রীর পরবর্তীতে বাবার বাড়ি যাওয়ার মাধ্যমে তালাক পতিত হবে না।

প্রশ্ন (৩৬): আমার স্ত্রী বিয়ের ২ মাসের মাথায় আমার অনুমতি ছাড়াই বাপের বাড়ি চলে যায়। পরে আমি তাকে আনতে গেলে সে ফিরে আসে না। তার শর্ত হলো যদি সংসার করতে হয়, তাহলে তার বাপের বাড়িতে গিয়ে করতে হবে; অন্যথায় ডিভোর্স দিতে বলে। এখন আমি কি করব? আমার কাছে দেনমোহরের টাকাও নেই।

-মো. রাজীব হোসেন
আশুলিয়া বাজার, সাভার, ঢাকা।

উত্তর: স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাবার বাড়িতে যাওয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয নয়। আবার সংসার করার জন্য স্বামীকে ঘরজামাই হওয়ার শর্তারোপ করা অন্যায় ও শরীআত বিরোধী শর্ত। এমন শর্ত বাতিল। রাসূল ﷺ বলেন, مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ 'যে ব্যক্তি এমন শর্ত করবে যা কুরআনুল কারীমে নেই (শরীআত বিরোধী শর্ত), তাহলে তা বাতিল; যদিও সে একশটি শর্ত করে' *(ছহীহ বুখারী, হা/২১৫৫)*। সাধারণত এমন অন্যায় শর্ত করার পেছনে মূল কারণ থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়া। সুতরাং করণীয় হলো উভয়পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ মুরব্বী নির্ধারণ করে সমঝোতা করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا 'তাদের উভয়ের (স্বামী-স্ত্রী) মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন শালিশ নিযুক্ত করবে; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত *(আন-নিসা, ৪/৩৫)*। আর যদি এতেও সমাধান না হয়, তাহলে স্ত্রীকে শাসন করার উদ্দেশ্যে স্বামী তালাক প্রদান করতে পারে।

মীরাছ

প্রশ্ন (৩৭): আমি জানি যে আমার বাবার হারাম উপার্জন আছে। কিন্তু সে ব্যাপারে আমার কথা বলার সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় তার মৃত্যুর পর সেই সম্পদ কি আমি গ্রহণ করতে পারব? এতে কি আমার পাপ হবে?

-শাকিল শুভ
বগুড়া।

উত্তর: এসময় সম্পদ যদি কারো থেকে আত্মসাৎ করা না হয় বা জোর করে দখল করা না হয়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ দান করে দিবে। আর বাকি অংশ ভোগ করতে পারে। তবে এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অসুস্থতায় রাসূল ﷺ তাকে দেখতে গেলে তিনি বলেন, একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত আমার কোনো ওয়ারিছ নেই। এখন আমি আমার সম্পদের দু-তৃতীয়াংশ ছাদাকা করতে পারি কি? রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, 'না'। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, 'এটাও অনেক বেশি' *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৬৮)*।

নারী বিষয়ক

প্রশ্ন (৩৮): মহিলাদের ক্ষেত্রে বাড়ির বাইরে চোখে সুরমা দেওয়ার মাসআলা কী? ঘরেও যদি সুরমা দেয় এবং বাইরে যাওয়ার আগে মুখ ধুয়ে নেয়, তবে চোখে সুরমা কিছুটা লেগে থাকে, তাহলে বাইরে গেলে কি গুনাহ হতে পারে?

-উম্মুল মুয়াজ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করলে দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার হয় এবং চোখের পাপড়ি গজায় *(আবূ দাঊদ, হা/৩৮৭৮)*। যার মাধ্যমে নারীদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, যা (সৌন্দর্য) আল্লাহ তাআলা গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন *(আন-নূর, ২৪/৩১)*। অতএব, নারীদের জন্য বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় চোখে সুরমা ব্যবহার করে গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে ঘরে

www.al-itisam.com

সুরমা ব্যবহার করার পর বাইরে যাওয়ার পূর্বে তা মুছবে/ধৌত করবে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে সামান্য চিহ্ন থেকে যায়, যা স্পষ্ট সাজসজ্জা হিসেবে প্রতীয়মান হয় না, তাহলে গুনাহ হবে না।

প্রশ্ন (৩৯): এক শায়খ বলেছেন, বিউটি পার্লারের সব জিনিস দিয়ে কনেকে সাজানো যাবে, কিন্তু পার্লারে গিয়ে নয়। প্রশ্ন হলো, পার্লারে গেলে সমস্যা কি? ইসলামে কি নারীরা নারীদের সাজাতে পারে না?

-জোহরা তাবাসসুম
রাজশাহী।

উত্তর: বিউটি পার্লারে মহিলাদের যেভাবে সাজানো হয় একজন মহিলা অন্য আম তথা সাধারণ মহিলার মাধ্যমে সেভাবে সাজতে পারবে না। এজন্য মার্কেটে অবস্থিত বিউটি পার্লারে সাজগোজ করা যাবে না। রাসূল ﷺ বলেন, ‘কোনো নারী অপর নারীর শরীর স্পর্শ করে স্বামীর সামনে যেন তা বর্ণনা না করে। কারণ হতে পারে স্বামী উক্ত নারীকে অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে থাকবে’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫২৪০; মিশকাত, হা/৩০৯৯)*। বরং কনেকে বাড়িতে ঘরোয়া পরিবেশে বোন, দাদি, নানি, মামি বা খালারা সাজাবে এবং সাজসজ্জার জন্য ব্যবহৃত সমস্ত প্রসাধনী সামগ্রী অবশ্যই হালাল হতে হবে।

প্রশ্ন (৪০): আমার এক বোন ফ্রান্সে থাকেন। ফ্রান্সের আইন অনুযায়ী কেউ পাবলিক স্থানে যদি নিকাব পরিধান করে, তাহলে জরিমানা করে। এমতাবস্থায় তার করণীয় কী?

-ইশতিয়াক তানযিম
সিলেট।

উত্তর: নারীর জন্য পরপুরুষের সামনে নিকাব ইত্যাদি দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে পর্দা করা ফরয *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)*। প্রথমত, একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এমন জায়গায় বসবাস করা উচিত নয়, যেখানে ইসলাম মেনে চললে জরিমানা প্রদান করতে হয়। দ্বিতীয়ত, যদি প্রয়োজনে এমন জায়গায় বসবাস করতেই হয়, তাহলে জরিমানা প্রদান করে হলেও পর্দার বিধান পালন করা আবশ্যক *(তিরমিযী, হা/১১৭৩)*। এক্ষেত্রে ইসলামের পক্ষ থেকে কোনো ছাড় নেই।

কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪১): উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বিচারের সময় একজন মুসলিমকে হত্যা করে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছিলেন। এই ঘটনা ওয়াজ মাহফিলে বলা হয়ে থাকে। এই ঘটনা কি ঠিক?

-মোস্তফা মনোয়ার
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর: উক্ত ঘটনা সঠিক নয়। মূল ঘটনাটি নিম্নে দেওয়া হলো- আবূল আসওয়াদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিবাদ নিয়ে এলে তিনি তাদের মধ্যে বিচার করলেন। কিন্তু যার বিরুদ্ধে বিচার হলো, সে বলল, আমাদেরকে উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কাছে নিয়ে চলুন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমরা উভয়ে তার কাছে যাও’। তারা উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর কাছে গিয়ে ঘটনা জানালে তিনি বললেন, সত্যিই কি এমন হয়েছে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাদের অপেক্ষা করতে বলে তরবারি নিয়ে বের হয়ে সেই ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফয়সালা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। অপর ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফিরে এসে ঘটনা জানালে তিনি বললেন, ‘আমি মনে করিনি যে উমার কোনো মুমিনকে হত্যা করার মতো দুঃসাহস করবেন’। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ‘তোমার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদে তোমাকে বিচারক মেনে নেয়...’ *(আন-নিসা, ৪/৬৫)*।

প্রশ্ন (৪২): উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের কারণ কী ছিল? ধন-সম্পদের লোভ কি কারণগুলোর মাঝে ছিল?

-সাকিব
সোনাগাজী, ফেনী।

উত্তর: ক. উহুদ যুদ্ধের প্রারম্ভে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মুসলিমদের বিজয় দান করেছিলেন। কিন্তু কিছু তিরন্দাজদের নির্দেশনা অমান্য এবং গনীমত অর্জনের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করার কারণে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল মুসলিমদের পক্ষে আসেনি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ‘আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে মতভেদ সৃষ্টি করলে আর যা তোমরা ভালোবাস তা তোমাদের দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিল আর কতক পরকাল চাচ্ছিল। এরপর তিনি পরীক্ষা করার জন্যে তোমাদেরকে তাদের হতে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল’ *(আলে ইমরান, ৩/১৫২)*। খ. উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিমরা ছাহাবী ছিলেন। তাদের ক্ষেত্রে ‘সম্পদের লোভ’ শব্দটি বেমানান। কিছু

www.al-itisam.com

তিরন্দাজ ছাহাবীদের ভুল ছিল এই যে, তারা ভেবেছিলেন বিজয় অর্জন হয়েই গেছে; মুশরিকরা আর যুদ্ধে এগোতে পারবে না। তাই আনন্দে গনীমতের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন। অথচ নির্দেশনা ছিল, إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا 'যদি তোমরা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় প্রত্যক্ষ কর, তবুও তোমরা নিজ স্থান থেকে সরবে না' *(ছহীহ বুখারী, হা/৪০৪৩)*। এই নির্দেশনা অমান্য করার ফলে যুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল মুসলিমদের পক্ষে আসেনি। কিন্তু তাদের এই ভুলকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে বলেছেন, ولقد عفا عنكم 'আর তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন' *(আলে ইমরান, ৩/১৫২)*।

প্রশ্ন (৪৩): একজন মুমিনের ঘুমানো, খাওয়াদাওয়া, পড়াশোনা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য এগুলো কি ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়? যদি হয় তাহলে কীভাবে নিয়্যত করলে ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে?

-কাওছার আহমেদ
টাউনহল, ময়মনসিংহ।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*। ইবাদত বলা হয়, আল্লাহ তাআলার যাবতীয় নির্দেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষেধ মান্য করা। আল্লাহ তাআলা হালাল উপার্জনের নির্দেশ প্রদান করেছেন *(আল-জুমুআহ, ৬২/১০)*। তাই আল্লাহর এই নির্দেশ পালনের নিয়্যতে ব্যবসা করা বা চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে পড়াশোনা করা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। খাওয়াদাওয়া ও ঘুমের ক্ষেত্রে এই নিয়্যত করতে হবে যে, এর মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা অর্জন হবে, যা সুন্দরভাবে ইবাদত পালনে সহায়তা করবে। মুআয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, أَحتسب نومتي كما أحتسب قومتي 'আমি ঘুমের ক্ষেত্রেও ছওয়াব প্রত্যাশা করি যেমনিভাবে রাতের ছালাতের ক্ষেত্রে ছওয়াব প্রত্যাশা করি' *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৪১)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামাআতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত দাঁড়িয়ে (ক্বিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদ) ছালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামাআতের সাথে আদায় করল, সে যেন সারারাত দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করল' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৬)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'মুমিনের ব্যাপার আশ্চর্যজনক। অবশ্যই তার সকল বিষয় তার জন্য কল্যাণময়। আর এটি মুমিন ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না। যদি তার কোনো আনন্দ আসে, তবে সে শুকরিয়া আদায় করে, যা তার জন্য কল্যাণময়। আর যদি তার উপরে কোনো দুঃখজনক কিছু আপতিত হয়, তাহলে সে ছবর করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৯৯)*।

প্রশ্ন (৪৪): মিশরের পিরামিডে সংরক্ষিত যে ফেরাউনের মমি (লাশ) রাখা হয়েছে, সেটি কি কুরআনে বর্ণিত মূসা আলাইহিস সালাম -এর ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ফেরাউনের লাশ?

-ইয়াসিন মিয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রবাসী)।

উত্তর: মিশরের পিরামিডে সংরক্ষিত যেই লাশকে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ফেরাউনের লাশ বলে প্রচার করা হয় সেটা আসলে নিশ্চিতভাবে তার লাশ বলা যায় না। বরং এই প্রচারিত লাশটি উন্মোচিত হয় ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে *(আন্তর্জাতিক আরবী বিশ্বকোষ, ১৩/৩৫০)*। এর আগে লাশটি কোথায় ছিল? প্রাচীন ইতিহাস বা তাফসীরগ্রন্থে এর আলোচনা নেই কেন? এমন অনেক প্রশ্ন রয়েছে যেগুলোর সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। বরং প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে কুরতুবীতে এর বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো, সূরা ইউনুসের ৯২ নম্বর আয়াতে ফেরাউনের শরীরকে না ডুবিয়ে মানুষদের জন্য শিক্ষার উপকরণ বানানোর যে কথা উল্লিখিত হয়েছে, এর ব্যাখ্যা হলো বনী ইসরাঈলের কিছু লোক বিশ্বাস করত, ফেরাউনের কখনো মৃত্যু হবে না। তাদের এই বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণ করতে মহান আল্লাহ তাআলা এই কথা বলেন। তিনি সমুদ্রের এক পাশে অবস্থিত উঁচু স্থানে তার লাশ নিক্ষেপ করেন। এরপর বনী ইসরাঈলের লোকেরা দেখে, ফেরাউনের সত্যিই মৃত্যু হয়েছে। তাদের বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণিত করা হয়। এরপর তার লাশকে আল্লাহ তাআলা সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন *(তাফসীরে কুরতুবী, ৮/৩৮০)*।

প্রশ্ন (৪৫): তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সিজদা করে *(আলে ইমরান, ৩/১১৩)*। এই আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-মো. ফয়েজউল্লাহ
২৪/২৮, মিরপুর ১২, ঢাকা ১২১৬।

উত্তর: উক্ত আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হলো, এই আয়াতে আহলে কিতাবদের সেসব আলেমদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেমন- আব্দুল্লাহ বিন সালাম, আসাদ বিন উবাইদ, ছা'লাবা বিন সা'ইয়াহ প্রমুখ। তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও আল্লাহর ইবাদত যথাযথভাবে পালন করতেন এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও তা অব্যাহত রেখেছেন। অতএব, এসকল আহলে কিতাবদের সমপর্যায়ের হতে পারবে না সেসব আহলে কিতাব, যাদের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিন্দা করেছেন *(তাফসীরে ইবনু কাছীর, ২/৯১)*।

প্রশ্ন (৪৬): মাসিক আল-ইতিছামের এক ফাতওয়ায় লাল রঙের পোশাক পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীছে এসেছে, আমি তাঁকে লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৫১)*। এটা কি বিপরীত হয়ে গেল না?

-ফয়সাল
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর: মাসিক আল-ইতিছামের ফাতওয়া এবং প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছের মাঝে বৈপরীত্য নেই। পুরুষের জন্য নিরেট ও অমিশ্রিত লাল রঙের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, আমাকে লাল রঙের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে *(নাসাঈ, হা/৫২৬৬)*। বারা বিন আযিব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (পুরুষদেরকে) লাল রঙের গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৬৩)*। প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা হলো, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই লাল রঙের পোশাক পরিধান করেছিলেন তা ছিল লাল ও কালো সুতা দ্বারা তৈরি এক ধরনের ইয়ামানী পোশাক। এটা নিরেট ও অমিশ্রিত লাল রঙের পোশাক ছিল না *(যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়িম, ১/১৩২-১৩৪)*।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৭): ইসলামে বিষণ্নতা, হতাশা ও মানসিক অশান্তি বা রোগ নিয়ে কী বলে? এগুলো কি শাস্তিস্বরূপ নাকি পরীক্ষা? এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

-গোলাম রাব্বি
বরিশাল।

উত্তর: ইসলামে বিষণ্নতা, হতাশা, দুঃখ, উদ্বেগ ও মানসিক অশান্তি ইত্যাদি কখনো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা, কখনো গুনাহ মাফের মাধ্যম, কখনো সতর্কবার্তা, আবার কারও ক্ষেত্রে নিজের গুনাহ ও ভুলের ফলও হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছুটা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন’ *(আল-বাকারা, ২/১৫৫)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ‘তোমাদের ওপর যে বিপদই আসে, তা তোমাদের হাতের কামাইয়ের কারণেই; আর তিনি অনেক কিছু ক্ষমা করে দেন’ *(আশ-শূরা, ৪২/৩০)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো মুসলিমের ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট বা বেদনা, এমনকি কাঁটা বিঁধলেও আল্লাহ এর মাধ্যমে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৩)*। বিষণ্নতা ও মানসিক অশান্তি থেকে পরিত্রাণের উপায়- ১. নিম্নোক্ত দু‘আ পড়া: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে আশ্রয় চাই; অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই; ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের প্রাধান্য থেকে আশ্রয় চাই’ *(ছহীহ বুখারী, হা/২৮৯৩)*। ২. ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা *(আল-বাকারা, ২/৪৫)*।

প্রশ্ন (৪৮): গুনাহে জারিয়া বা চলমান গুনাহের পথ বন্ধ করতে না পারলে করণীয় কী? যেমন- এমন কোনো ওয়েবসাইট যেখানে লাইক, কমেন্ট করলে ডিলিট করা যায় না, কিংবা ডিলেট করার পদ্ধতি জানা নেই?

-মো. হাবিবুল্লাহ
ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর: কেউ কোনো হারাম পোস্টে লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার করার পর অনুতপ্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত গুনাহ থেকে বিরত হওয়া এবং আন্তরিকভাবে তওবা করা আবশ্যক। সম্ভব হলে করা লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার মুছে ফেলতে হবে। আর তা মুছে ফেলা সম্ভব না হলে আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের গুনাহে পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো’ *(আত-তাগাবুন, ৬৪/১৬)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘গুনাহ থেকে তওবাকারী এমন, যেন সে কোনো গুনাহই করেনি’ *(ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫০)*। অতএব, গুনাহের বিষয়টি অপসারণের সাধ্য থাকলে তা অপসারণ করবে; সাধ্যের বাইরে হলে আন্তরিক তওবা করবে এবং পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প করবে। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো বিষয়ে দায়ী করেন না।

প্রশ্ন (৪৯): আমার প্রতিবেশী একজন হিন্দু লোক আছে, তিনি আমার সাথে খুবই আন্তরিক। আমি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা রাখি যদি উনি ইসলাম গ্রহণ করতেন। প্রশ্ন হলো, ইসলাম মেনে কীভাবে তাকে দাওয়াত দিতে পারি?

-জোবায়ের আহমেদ
পিরিজপুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর: একজন মুশরিককে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে তাকে বুঝাতে হবে যে, মূর্তিপূজা শিরক। আর শিরকের ফলাফল জাহান্নাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/৯৩)*। এছাড়া দাওয়াতের ক্ষেত্রে কুরআনী পদ্ধতি অবলম্বন

করা অধিক ফলপ্রসূ। কুরআনী পদ্ধতি হলো প্রথমে সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে আলোচনা করা। কারণ এই বিষয়ে উভয়পক্ষ একমত যে, সৃষ্টিকর্তা একজনই। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যদি আপনি তাদেরকে (মুশরিকদের) জিজ্ঞেস করেন, কে আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছে এবং কে সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছে? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৬১)*। এরপর বলা হবে, মুশরিকরা যাদের পূজা করে তাদের কেউ সৃষ্টিকর্তা নয়; বরং তারা সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ‘নিশ্চয় তোমরা (মুশরিকরা) আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক (পূজা করো), তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না; যদিও এই কাজে তারা একতাবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করে’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৭৩)*। সুতরাং যারা সৃষ্টি করতে পারে না তারা ইবাদতের যোগ্য নয়; বরং আল্লাহ তাআলাই ইবাদতের যোগ্য, কারণ তিনিই সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তাআলা বলেন, أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ‘যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাদের মতো, যারা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?’ *(আন-নাহল, ১৬/১৭)*। এর পাশাপাশি কুরআনে বর্ণিত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তিনি কীভাবে মুশরিকদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং শিরকের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

প্রশ্ন (৫০): আমার বয়স যখন প্রায় ১০/১১ বছর তখন বাবার পকেট থেকে টাকা, তার দোকান থেকে টাকা, চকলেট, ক্রিম চুরি করতাম। কিন্তু একটি হাদীছে জুতার ফিতা চুরির কারণে জাহান্নামে যাওয়ার কথা জেনে আমি ভীত ও হতাশ হয়ে পড়ি। বাবাকে বললে হয়তো আমার প্রতি বিশ্বাস হারাবে। তার দোকানেও বলতে পারছি না। এখন করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: চুরি করা জঘন্য পাপ। এজন্য আল্লাহ তাআলা চোরের হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন *(আল-মায়েদা, ৫/৩৮)*। তবে দণ্ড কার্যকর করার দায়িত্ব প্রশাসনের। পিতামাতার করণীয় হলো শৈশব থেকেই সন্তানকে চুরির মতো অপরাধ ও মন্দ দিকের ব্যাপারে দীক্ষিত করা। এরপরও যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তার বাবার পকেট অথবা দোকান থেকে চুপিসারে টাকা বা অন্য কিছু নিয়ে নেয়, তাহলে এতে তার গুনাহ হবে না। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ‘তিন শ্রেণির মানুষ শারঈ বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত নয়- ঘুমন্ত ব্যক্তি, জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত; শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল, মস্তিষ্ক সুস্থ হওয়া পর্যন্ত’ **(আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩)**।

তবে যদি সে অন্য কারো টাকা বা বস্তু চুরি করে, তাহলে তার গুনাহ না হলেও উক্ত টাকা বা বস্তু প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া আবশ্যক *(ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)*। আর যদি সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহলে তার গুনাহ হবে। এমতাবস্থায় পিতার সাথে আপস করে নিবে। অন্যথায় বাহির থেকে উপার্জন করে দোকানে জমা করবে।

সম্পাদকীয়-এর বাকি অংশ

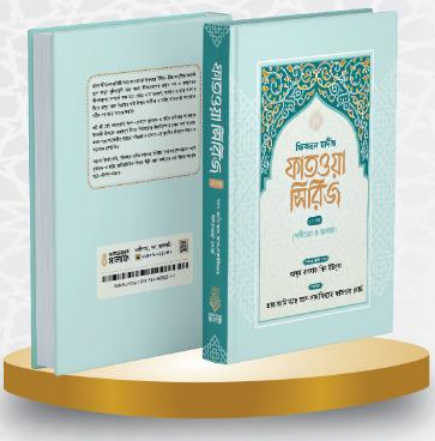
ইয়ামানের এই ইতিহাস দেখায়, সেখানে রাজনৈতিক মিত্রতা বারবার বদলেছে। সঊদী আরব একসময় যায়দী রাজতন্ত্রীদের সমর্থন করেছে, পরে প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে; ছালেহ প্রথমে হুথিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, পরে তাদের সহযোগী হয়েছেন, আবার শেষ পর্যায়ে তাদের ছেড়ে সঊদী জোটের সঙ্গে সমঝোতা চেয়েছেন। এখন ২০২৬ সালে এসে ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় হুথি-সঊদী যুদ্ধ শুরু হয়। বাব-আল মান্দেব দখল নিয়ে সেই যুদ্ধ ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। ইতোমধ্যে রিয়াদ বিমানবন্দরসহ মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে। এই যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী হলে বিশ্ব রাজনীতিতে যেমন বিশাল পরিবর্তন আসবে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের অর্থনীতিও বিশাল ধাক্কা খাবে। এখন দেখার পালা, এই পরিস্থিতিতে মক্কা চুক্তি কীভাবে কাজ করছে। আংকারা ও ইসলামাবাদ কীভাবে এই সময়ে সঊদীর পাশে দাঁড়াচ্ছে।

যাহোক, আমরা চাই মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো নিরাপদ হোক! মুসলিমদের রক্ত সুরক্ষিত থাকুক! আর আমাদের সবার মহান আল্লাহর এই বাণী স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলেন, ‘কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অন্যায় করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো; তা তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী’ *(আল-মায়েদা, ৫/৮)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ‘মুমিনদের দুই দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের এক দল অন্য দলের ওপর সীমালঙ্ঘন করলে, সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা করে দাও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন’ *(হুজুরাত, ৪৯/৯)*।

এই আয়াতগুলোর আলোকে আমরা চাই, কেউ যেন জুলুমের শিকার না হয়। বিশেষ করে, নিরপরাধ উমরাহকারী ইহরামের কাপড় পরিধানকারী যাত্রীবাহী বিমানের উপর যে হামলা হচ্ছে, তা স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন। অন্তত সকল প্রকার বিবাদ থেকে মক্কা-মদীনা ও উমরাহ-হজ্জযাত্রীদের নিরাপদে রাখতে হবে। যারা এই ন্যূনতম মানবিকতা ও ভদ্রতা রক্ষা করতে পারবে না, তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং নিজেদের সমস্যা সমাধান করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন! (প্র. স.)

www.al-itisam.com

মাকতাবাতুস সালাফ



ফিকহুল হাদীছ ফাতওয়া সিরিজ

সংকলনে: আল-জামিআহ আস সালাফিয়্যাহ ফাতওয়া বোর্ড
বোর্ড প্রধান: আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

ইসলামী জীবনের প্রথম শর্ত পবিত্রতা, আর তার সর্বোচ্চ প্রকাশ সালাত। এই দুই ইবাদতের শুদ্ধতা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। "ফিকহুল হাদীস ফাতওয়া সিরিজ"-এর এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে আল-ইতিছাম-এ প্রকাশিত দলিলভিত্তিক ফাতওয়াগুলোর বাছাইকৃত অংশ, সাথে সংযোজিত হয়েছে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক বিষয়।

পুরো গ্রন্থজুড়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পবিত্রতা ও সালাত-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। ওযু, গুসল, নাপাকি, মহিলাদের মাসিক অবস্থা, সালাতের রুকন ও শর্ত, জামাআত, ইমামতি, ভ্রমণকালীন নামায-সবই এখানে সাজানো হয়েছে দলিল ও ফিকহি বিশ্লেষণের আলোকে।

এই সংকলন পাঠককে ইবাদতের সঠিক অনুশীলনে সহায়ক ও শরঈ নির্দেশনা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

মূল্য: ~~৫৮০৳~~ ৫২০৳

মাসিক আল-ইতিছামের সম্মানিত গ্রাহক-এজেন্টগন পাচ্ছেন ১০% ছাড়ে।

মাকতাবাতুস সালাফ কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত

ইসলামের বিজয়গাথা
খিলাফাতে রাশিদা থেকে আব্বাসীয় যুগ

মূল: মাহমুদ শাকির
অনুবাদ: সায়্যিদ তাসনীম আল-আমান
সম্পাদনা: উস্তাদ আব্দুল্লাহ মাহমুদ

পৃষ্ঠা - ৩৫২ | মূল্য - ৩৩০ টাকা



সমলিঙ্গের প্রতি আসক্তি
মানবতার ভয়াবহ বিপর্যয়

লেখক: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

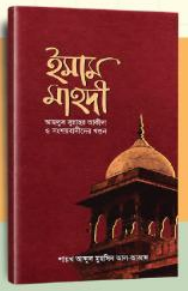
পৃষ্ঠা - ১১২ | মূল্য - ১১০ টাকা



ইমাম মাহদী
আহলুস সুন্নাহর আকীদা ও সংশয়বাদীদের খণ্ডন

মূল: শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ
অনুবাদ: সায়্যিদ তাসনীম আল-আমান
সম্পাদনা: উস্তাদ আব্দুল্লাহ মাহমুদ

পৃষ্ঠা - ১৩৬ | মূল্য - ১৩০ টাকা



আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

بسم الله الرحمن الرحيم

সালাফী কনফারেন্স ২০২৬-২৭

অনুষ্ঠানের সময়সূচি

১০ম বার্ষিক রাজশাহী

১২ ও ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ ইং

স্থান

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গন, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

৬ষ্ঠ বার্ষিক দিনাজপুর

১৮ ডিসেম্বর, ২০২৬ ইং

স্থান

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গন, তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর

১০ম বার্ষিক নারায়ণগঞ্জ

২৮ ও ২৯ জানুয়ারি, ২০২৭ ইং

স্থান

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মাঠ প্রাঙ্গন, বীরহাটাব-হাটাব, বীরবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

সভাপতিত্ব করবেন

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন; মহাপরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বাংলাদেশ

বক্তব্য পেশ করবেন:

সালাফী মানহাজের অনুসারী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম

আয়োজনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

ব্যবস্থাপনায়: আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ
ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী। মোবা: ০১৪০৭-০২১৮১৫